প্রতিশোধের একদিক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

মধুছন্দা ও সুব্রত রুদ্রকে

আমাদের প্রকাশিত

এই লেখকের অন্যান্য বই :

পায়ের তলায় মাটি
রাতপাখি
গল্পসংগ্রহ (১ম ২য় ৩য় খণ্ড)
কোথায় আলো ?
ভোরবেলা পার্কে
কোকিল ও লরিওয়ালা
অচেনা মানুষ
মহাপৃথিবী
রক্ত
আমি কি রকম ভাবে বেঁচে আছি [কবিতা]
কাব্যসংগ্রহ (১ম)
কাব্যসংগ্রহ (২য়)
দাঁড়াও সুন্দর [কবিতা]
এসেছি দৈব পিকনিকে [কবিতা]

গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প
এক জীবনে
মায়াকাননের ফুল
আগামীকাল
বুকের মধ্যে আগুন
হীরক দীপ্তি
বৃত্তের বাইরে
রূপালি মানবী
আজকের হিন্দী গল্প
বন্দী জেগে আছো [কবিতা],
অন্যদেশের কবিতা
মন ভাল নেই [কবিতা]
দেখা হলো ভালোবাসা বেদনায় [কবিতা]

প্রতিশোধের একদিক

সূচীপত্র

পূজারী

কলিং বেলটা বেশ মিষ্টি ভাবে টুং টাং টুং টাং শব্দে বাজে।

সুপ্রিয়া একটি ইংরেজী উপন্যাসের মধ্যে গভীর ভাবে ডুবে ছিল. দুপুরবেলাটা এই সময় সে বিছানায় শুয়ে বই পড়ে, কিন্তু ঘুমোয় না। কলিং বেলের শব্দ শুনে সে শিয়রের কাছে ঘড়িটা দেখল। তিনটে বাজে। এই সময় তো কারুর আসবার কথা নয়।

অনেক সময় ফেরিওয়ালারা এসে বিরক্ত করে। কিন্তু দরজা না খোলা পর্যন্ত বেল বাজিয়েই যাবে। উপায় নেই, বই মুড়ে রেখে সুপ্রিয়াকে উঠতে হল।

সুপ্রিয়া খেয়াল করেনি, বাইরে কখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। বারান্দায় অনেক জামা-কাপড় মেলা আছে, সেগুলো এক্ষুণি না-তুললে একেবারে ভিজে যাবে। অথচ কলিং বেলটা বাজল তৃতীয়বার।

সুপ্রিয়া দৌড়ে গিয়ে আগে দরজাটা খুলল।

হাতে একটি ছাতা, ধুতির ওপর শার্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে শশধর। মুখে বিগলিত হাসি। সে বলল, অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম নাকি ?

সুপ্রিয়া অবাক হবারও সময় পেল না। আপনি বসুন—বলেই সে ছুটে গেল বারান্দায়।

এর মধ্যেই জামা-কাপড়গুলো একটু একটু ভিজে গেছে। আকাশ কালো, বৃষ্টি আরও বাড়বে, তাই সুপ্রিয়া জামা-কাপড়গুলো তুলে ফেলাই ঠিক করল। ঘরের মধ্যে মেলে দিতে হবে। কাপড় তুলতে তুলতে সুপ্রিয়ার ভুরু কুঁচকে গেল। হঠাৎ এই সময় ঐ লোকটা এসেছে কেন ?

শশধর সুপ্রিয়ার স্বামী সিদ্ধার্থর বন্ধু। ঠিক বন্ধুও বলা যাবে না, এক সময় সিদ্ধার্থ আর শশধর একসঙ্গে স্কুলে পড়ত। তারপর দুজনের জীবন সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে। কিন্তু স্কুলের পুরোনো বন্ধুকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারে না সিদ্ধার্থ। রাস্তায় দেখা হলে দু-চারটে কথা বলে। সিদ্ধার্থর খুব তাস খেলার নেশা। ছুটির দিনে কোথাও না কোথাও তাস খেলতে যাবেই। মাঝে মাঝে নিজের বাড়িতেও সে তাসের আসর বসায়। সেই রকমই দু-একটা তাস খেলার আসরে শশধরকে দেখেছে সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া আবার ভাবল, অফিসের দিনে দুপুরবেলা লোকটা কি মনে করেছে

যে এখানে তাস খেলা চলছে ? অদ্ভুত তো !

পরক্ষণেই তার মনে হল, লোকটা টাকা ধার চাইতে আসেনি তো ? সিদ্ধার্থের কাছে যেন দু-একবার শুনেছে যে ঐ লোকটার অবস্থা ভালো নয়। ওর চেহারা এবং পোশাকও সিদ্ধার্থের বন্ধু হিসেবে একেবারে বেমানান। সিদ্ধার্থের আর কোনো বন্ধু ধুতির ওপর শার্ট পরে রাস্তায় বেরোয় না। হাতে আবার একটা পুরোনো ছাতা!

কাপড়-টাপড়গুলো গুছিয়ে সুপ্রিয়া এলো বসবার ঘরে।

শশধর একটি পত্রিকার ছবি দেখছিল, সেটা নামিয়ে রেখে সে আবার ঠোঁটে বিগলিত হাসিটুকু এঁকে জিজ্ঞেস করল, বৌদি, ছেলে কেমন আছে ?

ছেলে ? কেন ?

শশধর একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, পরশুদিন অজয়বাবুর বাড়ি থেকে সিদ্ধার্থ তাস খেলা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে এলো। বলল, ওর ছেলের জ্বর। আমি কালই আসব ভেবেছিলাম, হয়ে ওঠেনি। আজ এ পথ দিয়ে যাবার সময় মনে করলাম, আপনার ছেলেকে একবার দেখে যাই।

সুপ্রিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। হঠাৎ কেউ এসে ছেলের কথা জিজ্ঞেস করলেই বুক কেঁপে ওঠে। সে হেসে বলল, বাবলু ! হ্যাঁ পরশু বিকেল থেকে ওর গা-টা একটু গরম গরম হয়েছিল। বৃষ্টিতে ভেজে তো···কিন্তু কালই কমে গেছে···আজ তো বাবলু স্কুলে গেছে !

স্কুলে গেছে ? দু-একদিন বিশ্রাম দিলে পারতেন। এই সময়টা ভালো না, বাচ্চাদের প্রায়ই জ্বর-জারি হচ্ছে শুনতে পাই।

ওরা কি আর এমনি বিছানায় শুয়ে থাকতে চায়। ছটফটে ছেলে, বাড়িতে থাকতেই চায় না।

না না, তবু সাবধান হওয়া ভালো। বুকে ঠাণ্ডা বসে গেলে অনেক ঝামেলা হতে পারে, এই তো আমার এক ভাগ্নে ব্রংকাইটিসে ভুগছে।

শশধরের কাছ থেকে সুপ্রিয়া এ সব ব্যাপারে কোনো উপদেশ শুনতে চায়না। স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে তার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। ছেলের কি করে যত্ন নিতে হয় সে জানে। বন্ধুর ছেলের সাধারণ একটু জ্বর হলেই কেউ এমন দুপুরবেলা দেখতে আসে ? অদ্ভুত !

শশধর এক পায়ের চটি থেকে পা বার করে অন্য পায়ের ওপরে উঠিয়ে বসল।

এই রে, লোকটা আরও অনেকক্ষণ বসবে নাকি ? সুপ্রিয়ার মন টানছে রহস্য গল্পের বইটি।

কিছু দিন সিদ্ধার্থ বোম্বাইতে বদলি হয়ে ছিল। প্রায় বছর তিনেক। বোম্বাইয়ের বেশীর ভাগ মেয়েই আজকাল বাড়ির মধ্যে শাড়ি পরে না। সেই থেকে সুপ্রিয়ারও অভ্যেস হয়ে গেছে, কলকাতাতেও সে বাড়িতে একটা লম্বা ঢোলা ম্যাক্সি পরে থাকে। এই গরমে, লোড শেডিং-এ শাড়ির চেয়ে ম্যাক্সি

অনেক আরামের। বিশিষ্ট কোনো লোক এলে সুপ্রিয়া এর ওপর একটা মোটা ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে দেয় তাড়াতাড়ি।

কোনো ফেরিওয়ালা-টেরিওয়ালা বেল দিয়েছে ভেবে সুপ্রিয়া ড্রেসিং গাউনটা না চাপিয়েই দরজা খুলেছিল। এখন তার একটু অস্বস্তি লাগছে। কিন্তু এখন আবার ড্রেসিং গাউনটা পরে এলে এ লোকটা ভাবতে পারে, সে তাকে আরও কিছুক্ষণ বসতে বলছে। তা ছাড়া এ তো আর বিশিষ্ট লোক নয়। চলে গেলেও কিছু যায় আসে না। সুপ্রিয়া চেয়ারে না বসে দাঁড়িয়ে রইল।

শশধর সরাসরি সুপ্রিয়ার শরীর বা মুখের দিকে তাকায় না। লাজুক ভাবে মুখ নিচু করে আছে। সে আবার বলল, বৌদি, কখনো দরকার হলে বলবেন, আমার চেনা খুব ভালো ডাক্তার আছে, ডঃ জি সি. দাস, নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?

সুপ্রিয়া বলল, আমার নিজের দাদা ডাক্তার।

ও, তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। তবু বলে রাখলাম, যদি কখনো দরকার হয় ডঃ জি সি দাসকে আমি ডাকলে না বলতে পারে না কখনো।

সুপ্রিয়া বুঝল লোকটা নিজের গুরুত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে। কে কোথাকার জি সি দাস তার ঠিক নেই। সুপ্রিয়ার দাদা নাম করা ডাক্তার। কলকাতার সব বড় বড় ডাক্তাররা তাঁকে চেনেন।

সুপ্রিয়ার একটুও ইচ্ছে করছে না লোকটার সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু মুখের ওপর তো বলা যায় না, আপনি এখন চলে যান!

শশধর পকেট থেকে একটি কাগজের ঠোঙা বার করল। তার মধ্যে একটি লাল টুকটুকে আপেল। খুব সলজ্জ ভাবে সেটি টেবিলের ওপর রেখে বলল, আপনার ছেলের জন্য এনেছিলাম। ভাবলাম, জ্বর মুখে যদি ভালো লাগে।

সুপ্রিয়া হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না। তার বাড়িতে সব সময় আপেল থাকে। বাবলু একদম খেতে চায় না। আজকালকার ছেলেরা ভালো জিনিস পছন্দ করে না, আপেল এক কামড় দিয়ে ফেলে দেবে, কিন্তু ফুচকাওয়ালা আসুক কিংবা ঝালমুড়ি অমনি গপাগপ করে খাবে।

এই লোকটা আপেল নিয়ে এসেছে, তাও একটা। মোটে একটা আপেল কেউ কারুর বাড়িতে নিয়ে যায়? তাছাড়া ঐ লাল টুকটুকে আপেলগুলো ভীষণ টক হয়। লোকটা আপেলও চেনে না।

এ কি, আপনি আবার এ সব আনতে গেছেন কেন?

এমনিই, ভাবলাম, খালি হাতে যাব। রেখে দিন, ওকে খেতে বলবেন।

সুপ্রিয়া আরও দু-একবার আপত্তি জানাল। কিন্তু কেউ ছোটদের জন্য কিছু জিনিস নিয়ে এলে তা জোর করে ফেরত দেওয়া যায় না।

এবার লোকটাকে কিছু একটা খেতে-টেতে বলা উচিত। সুপ্রিয়া দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। কাজের লোকটি ছুটি নেওয়ায় এমন মুশকিল হয়েছে। গতকাল

তার ফেরার কথা ছিল, ফেরেনি। ওরা একদম কথা রাখে না।

ফ্রিজে মিষ্টি-টিষ্টি কিছুই নেই। থাকলে বড্ড ভালো হত। থাকবার মধ্যে আছে কিছু আপেল আর কলা। ও আপেল এনেছে, এখন ওকে ও আপেল খেতে বলা যায় না। আপনি একটা কলা খাবেন? এ কথাও কি বলা যায়! ধুৎ।

বাধ্য হয়েই সুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করল, আপনি চা খাবেন?

শশধর বলল, না, থাক। আপনার অসুবিধে হবে, এই অসময়ে।

না, অসুবিধে আর কি?

তাহলে খেতে পারি আপনার হাতের চা।

সুপ্রিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল। রহস্য গল্প পড়তে পড়তে উঠে আসা যে কি কষ্টকর! এখন আবার তাকে চা বানাতে হবে। বাড়িতে কফিও নেই। কফি চায়ের চেয়ে তাড়াতাড়ি বানানো যেত।

গ্যাস স্টোভে গরম জল চাপিয়ে সুপ্রিয়া এবার ড্রেসিং গাউনটা পরে নিতে গেল। যতই এলেবেলে হোক, তবু একজন পুরুষ মানুষ তো, বেশীক্ষণ এই পাতলা ম্যাক্সিটা পরে সহজ ভাবে ঘোরাফেরা করা যায় না।

শশধরের চেহারা রোগা-পাতলা, মুখখানাও শুকনো, নাকের নিচে সরু গোঁফ। সে অধিকাংশ সময়ই মাটির দিকে চেয়ে থাকে, দু-একবার চকিতে সুপ্রিয়াকে দেখে নেয়। এখনো কোনো নেমন্তন্ন বাড়িতে গেলে অনেকে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে, ঐ সুন্দরী মহিলাটি কে?

চা তৈরি হবার আগেই খুব ঝেঁপে বৃষ্টি এলো। বারান্দার দরজাটা বন্ধ করার পরও খানিকটা জল গড়িয়ে এলো ভেতরে। বৃষ্টির ছাট লেগে লেগে দরজাটার অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে। সুপ্রিয়া আপন মনেই বলল, এই এক ঝামেলা, যখন তখন বৃষ্টি আর অমনি ভেতরে জল আসবে!

শশধর উঠে গিয়ে দরজাটা পরীক্ষা করল। তারপর বিজ্ঞ ভাবে বলল, খানিকটা অ্যালমুনিয়ামের পাত দরজার নিচের দিকে লাগিয়ে দিলে বৃষ্টি আটকাতে পারে। তাতে আর জল ঢুকবে না।

এই উপদেশ সুপ্রিয়াকে আরও দু-একজন দিয়েছে। এর বিরুদ্ধেও বলেছে কয়েকজন। সে চুপ করে রইল।

লাগাবেন অ্যালমুনিয়ামের পাত? আমি যোগাড় করে দিতে পারি।

তাতে কোনো লাভ হবে?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হবে। আমি নিয়ে আসব। চেনা মিস্তিরিও আছে, সে-ই দেবে ঠিকঠাক করে।

নাঃ, দরকার নেই। দরজাটাই পাল্টে ফেলতে হবে।

পুরো দরজাটা পাল্টাবেন? কেন, আগে খানিকটা অ্যালমুনিয়ামের পাত লাগিয়ে দেখুন না। তাতে খরচ কম পড়বে—আমার চেনা আছে।

বসবার ঘরের দরজার খানিকটা অংশে অ্যালমুনিয়ামের পাত লাগালে যে বিচ্ছিরি দেখায়, তা বোঝবার ক্ষমতা নেই এই লোকটার।

সুপ্রিয়া দৃঢ় ভাবে বলল, না, দরজাটাই পাল্টাব ঠিক করে ফেলেছি।

মাত্র এক কাপ চা বানিয়ে নিয়ে এলো সুপ্রিয়া।

শশধর জিজ্ঞেস করল. এ কি. আপনি খাবেন না?

না। আমি বেশী চা খাই না। আপনার বন্ধু ফিরলে ছ'টার সময় ওর সঙ্গে একসঙ্গে এক কাপ খাই।

সিদ্ধার্থ তো খুব চা খায়।

হ্যাঁ, ও খায়।

ইস, শুধু শুধু আমার জন্য আপনাকে চা বানাতে হল কষ্ট করে।

না এতে কষ্টের কি আছে?

লোকটা বুঝি ভেবেছিল, সুপ্রিয়াও ওর সামনে চায়ের কাপ নিয়ে বসবে। তাতে ও আরও গল্প জমাবার সুযোগ পাবে। সুপ্রিয়া এ পর্যন্ত একবারও ওর সামনে বসেনি। এই ধরনের লোকদের সঙ্গে সুপ্রিয়ার গল্প করার মতন কিছুই নেই।

শশধর একটি সিগারেট ধরাল।

এই রে. আরও কতক্ষণ বসে থাকবে কে জানে! এই ধরনের লোকদের যে কি ভাবে বিদায় করা যায়, তা সুপ্রিয়া জানে না। এর চেয়ে আর কত বেশী ঠাণ্ডা ব্যবহার করবে।

আপনি নিজেই চা নিয়ে এলেন, আপনাদের সেই কাজের লোকটি কোথায়?

সে ছুটি নিয়েছে। এমন মুশকিলে পড়েছি।

ওরা ছুটি নিলে সহজে ফিরতে চায় না। কত দিনের জন্য গেছে?

বলেছিল সাত দিন. এই তো বারো দিন হয়ে গেল।

তাহলে দেখুন, ফেরে কিনা সন্দেহ।

ছেলেটা খুব বিশ্বাসী ছিল। এখন লোক পাওয়া এমন শক্ত।

আর কথা না বাড়িয়ে সুপ্রিয়া চলে গেল অন্য কোনো ঘরের জানলা দিয়ে জল ঢুকছে কিনা দেখতে।

শশধর উঠল বৃষ্টি ধরে যাবারও দশ মিনিট পরে। টেবিলের ওপর পড়ে রইল তার আনা টুকটুকে লাল রঙের আপেলটা। ওটা সুপ্রিয়া তার ঠিকে ঝিকে দিয়ে দেবে ঠিক করল। তারপর আবার সে ফিরে গেল ওর গল্পের বইয়ে।

রাত্রে সুপ্রিয়া তার স্বামীকে বলল, আজ দুপুরে তোমার এক বন্ধু এসেছিল।

কে?

ঐ যে শশধর না কি যেন নাম?

সিদ্ধার্থ হাসতে আরম্ভ করল উঁচু গলায়।

হাসছ কেন?

আমি ভাবলুম, আমার কোনো বন্ধু বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে দুপুরবেলা

আসছে তোমার সঙ্গে প্রেম করতে। বাড়িতে সুন্দরী স্ত্রী থাকার বিপদ অনেক।

বাজে কথা বল না!

তাহলে শশা এবার তোমার ওপর ভর করবে মনে হচ্ছে।

তার মানে?

রমেন বলছিল, কিছুদিন ওর বাড়িতেও যাতায়াত শুরু করেছিল শশা। রমেন যখন থাকে না, সেই সময় যায়। রমেনের বউ রত্না তো একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিল। অথচ মজা কি জানো, শশা কক্ষনো কোথাও খারাপ ব্যবহার করে না, কোনো অসভ্যতা করে না, দু' চোখ দিয়ে বিশ্রী ভাবে মেয়েদের শরীর চাটে না, শুধু চুপচাপ বসে থাকে।

আজ দুপুরেও সেই রকম বসে ছিল!

ঐ তো বললুম। আমরা স্কুলে ওকে বলতুম, শশা শশা জিনিসটার কোনো গুণও নেই, দোষও নেই। ও ঠিক সেই রকম।

রত্না শেষ পর্যন্ত কি করল?

রত্না তোমার থেকে অনেক বেশী ভদ্র। রোজ দুপুরে ওকে চা করে খাওয়ায়। বেচারির আবার দুপুরে ঘুমোনো অভ্যেস। রত্নাকে ছেড়ে এখন তোমার কাছে কেন এসেছে তা অবশ্য বুঝতে পারছি না।

একদিনই তো মোটে এসেছে। বাবলুকে দেখতে এসেছিল। তুমি পরশু বলেছিলে না বাবলুর জ্বর?

হ্যাঁ, তা বোধ হয় বলেছিলাম। আমাদের তাস খেলার আসরে ও চুপচাপ বসে থাকে। আজকাল তো ওকে খেলতে নেওয়া হয় না।

কেন, খেলতে নাও না কেন?

আমরা তো স্টেকে খেলি। ও পয়সা পাবে কোথায়?

উনি চাকরি-টাকরি করেন না?

করপোরেশানে কী যেন একটা সামান্য চাকরি করে। শুনেছি ওদের ডিপার্টমেন্টে খুব ঘুষের ব্যাপার আছে। তা শশধরটা এমনই অপদার্থ যে ঘুষও নিতে পারে না। শুধু ঐ অফিসে কাজ করার একটা সুবিধে, যখন তখন বেরিয়ে পড়া যায়।

বাবলুর জন্য একটা আপেল এনেছিলেন।

ওরেব্ বাবা! পয়সা খরচ করেছে শশা? ও যে হাড় কিপটে। তা হলে খুব গুরুত্বের ব্যাপার বলতে হবে। তুমি এর মধ্যে খুব সেজেগুজে কোনো দিন বেরিয়ে ছিলে? আর সে সময় ও তোমায় দেখেছে?

ধ্যাৎ!

পরদিন দুপুরে লোডশেডিং। কলিং বেল বাজবে না। দরজায় আওয়াজ হচ্ছে ঠুক ঠুক ঠুক ঠুক।

সুপ্রিয়া শিয়রের দিকে চেয়ে দেখল ঠিক তিনটে বাজে। উঠে এসে সো

দরজার ম্যাজিক আই দিয়ে দেখল। কোনো সন্দেহ নেই, আজও শশধর এসেছে!

দরজা না খুললে তো ঠুক ঠুক করতেই থাকবে। আজ কোন্ ছুতোয় এসেছে লোকটা? শুধু যেন সেই জানার কৌতূহলেই দরজা খুলল সুপ্রিয়া।

আজও সেই একই পোশাক, হাতে ছাতা, মুখে বিগলিত হাসি।

আজও প্রথম কথাটি একই, অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম—

সুপ্রিয়া আজ আগেই মোটা হাউস কোটটা পরে শরীর ভালো করে ঢেকে নিয়েছে। সে কোনো কথা বলল না।

একটু দূরে দাঁড়ানো কাকে যেন ডেকে শশধর বলল, এই আয়, এদিকে আয়— দেখুন তো একে আপনার পছন্দ হয় কি না!

সুপ্রিয়া সবিস্ময়ে তাকাল। মলিন ধুতি ও গেঞ্জি পরা আর একটি লোক দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।—এ কে?

আমাদের অফিসের একজন বেয়ারার ভাই। সবে দেশ থেকে এসেছে, চাকরি খুঁজছে। তাই আমি ভাবলাম, আপনার এখানে নিয়ে আসি। আপনার রান্নার লোক নেই··একে দিয়ে কাজ চালানো যায়।

লোকটির চেহারা দেখে মনে হয় না সে কোনোদিন কোনো গৃহস্থ বাড়িতে কাজ করেছে। কেমন যেন বুনো বুনো ভাব। গ্রামের দিকে কোনো নৌকোয় মাঝি কিংবা মোষের পালের রাখাল হলেই যেন একে মানায়।

আমতা আমতা করে সুপ্রিয়া বলল, এ কি রান্না-বান্নার কাজ পারবে?

হ্যাঁ সব পারবে। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখুন না।

এই যে, তোমার নাম কী?

জীবনকৃষ্ণ দাস।

তুমি কোথাও রান্নার কাজ করেছ কখনও?

আজ্ঞে না।

সুপ্রিয়া শশধরের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তবে?

শশধর সঙ্গে সঙ্গে বলল, কখনও করেনি বলে যে পারবে না তার তো কোনো মানে নেই। শিখিয়ে নিলে সবই পারবে। বৌদি, ভালো করে শেখালে বাঘকে দিয়েও হাল চাষ করানো যায়। ঠিক কি না!

শশধর বোধহয় সিদ্ধার্থের চেয়ে বয়েসে বড়ই হবে, অন্তত চেহারায় সেই রকম দেখায়। সে সুপ্রিয়াকে বৌদি বলে ডাকে বলে সুপ্রিয়ার বেশ অস্বস্তি হয়।

এই শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা সুপ্রিয়ার ঠিক পছন্দ নয়। ঝি, চাকর, রান্নার লোককে অনেক চেষ্টায় কাজ-টাজ ঠিক মতন শেখালে তারপর সে একদিন ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়। তখন রাগ ধরে দারুণ। তার চেয়ে বাবা তৈরি লোক নেওয়াই ভালো।

শশধর সেই লোকটিকে বলল, তুই একটু বাইরে বোস।

তারপর সুপ্রিয়াকে বলল, ভেতরে চলুন, আপনাকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।

সুপ্রিয়া এতক্ষণ শশধরকে ভেতরে আসতে বলেনি। কথাবার্তা সব হচ্ছিল বাইরে দাঁড়িয়ে।

ভেতরে ঢুকে নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিল শশধর। তারপর যেন একটা ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বলল, মাইনে দিতে হবে খুব কম। এমন কি প্রথম মাসে কিছু না দিলেও চলবে।

সুপ্রিয়া হেসে ফেলল।

শশধর বলল, হ্যাঁ, ও কিছু চাইবে না। ওর তো এখন খাওয়া থাকারই জায়গা নেই।

আজকাল কোনো লোককে মাইনে না দিয়ে কাজ করানো যায়?

আমি বলছি বৌদি, ও বর্তে যাবে। এমন ভালো বাড়িতে থাকবে—

শশধর চেয়ার টেনে বসল। এবার বোধ হয় সে চায়ের আশা করবে।

সুপ্রিয়া হঠাৎ কণ্ঠস্বর বদলে বলল, আমার এখন লোক দরকার নেই।

শশধরের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো, অ্যাঁ!

আমি এখন লোক রাখব না।

আপনার লোক নেই, আপনার এত অসুবিধা হচ্ছে—

শুনুন, আমার যে লোক আছে, সে খুব বিশ্বাসী।

এও খুব বিশ্বাসী, বৌদি। আমি গ্যারাণ্টি।

আমার লোকটি কাজকর্ম খুব ভালো জানে। ছুটি নিয়ে গিয়ে ফিরতে দু-চারদিন দেরি করছে বটে, কিন্তু আমি জানি, সে ঠিকই ফিরে আসবে। এখন আমি নতুন লোক রাখব না।

অন্তত দু-চারদিনের জন্য রাখুন। আপনার অসুবিধে হচ্ছে ভেবেই ওকে এনেছি।

নতুন লোক রাখার অসুবিধে আছে। তাতে কাজের ঝঞ্ঝাট আরও বাড়ে।

ও। বলে শশধর একটুক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে মুখ তুলে সুপ্রিয়ার দিকে একবার কাতর ভাবে তাকাল। সে যেন সুপ্রিয়ার কাছ থেকে কিছু একটা দয়া চায়।

বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিলে এই ফ্ল্যাটটা একেবারে আলাদা হয়ে যায় গোটা বাড়ি থেকে। পর পর কয়েকটা দুপুরে সুপ্রিয়া একদম একা আছে। শশধর কি তা জেনে শুনেই এসেছে?

অবশ্য শশধরকে দেখে একটুও ভয় পায় না সুপ্রিয়া।

শশধর তার দৃষ্টি, সুপ্রিয়ার মুখে নয়, তার নগ্ন ডান বাহুর ওপর স্থির রেখেছে। খুব ফর্সা রং বলে সুপ্রিয়ার হাতখানি মাখনের তৈরি বলে মনে হয়।

সুপ্রিয়া জানে শশধরের ঐ লোকটিকে রাখলে আবার কাল দুপুরে আসবে শশধর। তখন তো ও ভালো রকম ছুতো পেয়ে যাবে। তার দেওয়া লোক কেমন

কাজ করছে, সে খবর নিতে শশধর তো আসতেই পারে।

তা হলে ওকে রাখবেন না বৌদি ?

না।

শশধর কি এখন চায়ের জন্য অপেক্ষা করছে ? রোজ রোজ সুপ্রিয়া কাউকে চা তৈরি করে খাওয়াতে পারবে না।

আমার দিদির জ্বর। একবার দেখতে যাব···আমাকে এক্ষুণি বেরুতে হবে।

শশধর আবার বলল, অ্যাঁ ?

আমাকে এক্ষুণি বেরুতে হবে আজ।

শশধর এমন বোকা নয় যে এই ইঙ্গিত বুঝবে না। সে খুব লজ্জিত ভাব করে বলল, ও! আপনাকে অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম।

সুপ্রিয়া ভদ্রতা করেও কোনো উত্তর দিল না। শশধর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি তাহলে আজ যাই। আপনাকে বেরুতে হবে যখন।

দরজার কাছে গিয়েও মরীয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করে শশধর আবার বলল, আপনি কোন্ দিকে যাবেন ?

সুপ্রিয়া গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, যোধপুর পার্কে

আপনি কিসে যাবেন ? একটা ট্যাক্সি ডেকে দেব ?

ট্যাক্সির দরকার নেই, আমি রিক্শা করে চলে যাব।

তা হলে রিক্শা ডেকে দিই ?

আমাদের বাড়ির নিচেই রিক্শা পাওয়া যায়। আমার তৈরি হতে খানিক-ক্ষণ সময় লাগবে।

ও। আচ্ছা চলি, বৌদি।

এবার সত্যি সত্যি চলে গেল শশধর।

দরজা বন্ধ করে হাউস কোটটা খুলে ফেলল সুপ্রিয়া। লোড শেডিং-এর গরমের মধ্যে এই মোটা জিনিসটা এতক্ষণ পরে থাকতে তার রীতিমতন কষ্ট হচ্ছিল।

দুপুরবেলা এই ধরনের উটকো জ্বালাতন কারুর ভালো লাগে না।

বিছানায় ফিরে গিয়ে গল্পের বই খোলার একটু পর সুপ্রিয়ার হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। লোকটা বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নেই তো ?

হয়তো শশধর যাচাই করতে চায় সুপ্রিয়া সত্যিই এখন বাড়ি থেকে বেরুবে কি না! অথবা মিথ্যে কথা বলে তাকে বিদায় করা হল! কথাটা মনে পড়া মাত্র সুপ্রিয়া আবার উঠে বাইরের দিকের বারান্দাটায় চলে এলো।

এদিক ওদিক চোখ ঘুরিয়ে দেখতেই চোখে পড়ল মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে শশধর। সিগারেট টানছে আর এই বাড়ির দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। সুপ্রিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল পর্যন্ত। শশধরের কী তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি!

সুপ্রিয়া দৌড়ে চলে এলো ভেতরে।

হাউস কোট ছাড়া শুধু এই একটা পাতলা জামা পরে সে কখনও বাইরের দিকের বারান্দায় দাঁড়ায় না। পাড়ার ছেলেরা হ্যাংলা ভাবে তাকায়। সুপ্রিয়া সেটা খেয়ালই করেনি।

বিছানায় ফিরে এসে সে আপন মনে হাসতে লাগল। একলা একলা হাসতে অনেক সময় দারুণ ভালো লাগে। শশধর দাঁড়িয়ে থাক যতক্ষণ খুশি। সে কি আবার জিজ্ঞেস করবে, কই বৌদি, বেরুলেন না তো! এতখানি সাহস তার হবে?

ঘণ্টাখানেক বাদে সুপ্রিয়া আর একবার গায়ে হাউস কোট চাপিয়ে বারান্দায় গিয়ে দেখে এলো। না, শশধর নেই।

সেদিন রাত্রে সিদ্ধার্থকে সুপ্রিয়া বলল, তোমার বন্ধু আবার এসেছিল।

সিদ্ধার্থ বলল, কে? শশা! এত ঘন ঘন!

সুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করল, ওদের কি অফিসে কাজ-টাজ কিছুই থাকে না? ঠিক তিনটের সময়।

ওদের কাজকর্ম না করলেও চলে। আজ কি ছুতো নিয়ে এসেছিল?

আমার জন্য রান্নার লোক যোগাড় করে এনেছিল।

শশাটা করিৎকর্মা আছে তো। একদিনে লোক যোগাড় করে ফেলল! লোকে আজকাল মাথা কুটেও চট করে একজন রান্নার লোক পায় না। তাকে রাখলে না?

একদম গাঁইয়া। আমাদের কাজ চলবে না।

তোমার দিদির বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে না কেন? তার তো একদম লোক নেই।

হ্যাঁ দিদির বাড়িতে ওকে পাঠাই, তারপর তোমার বন্ধু শশধর রোজ দুপুরে দিদির কাছে গিয়ে উৎপাত করুক আর কি। দিদিও দুপুরে একলা থাকে।

তোমাকে ছেড়ে ও এখন চট করে অন্য কোনো মহিলার কাছে যাবে না। তোমাকেই ওর পছন্দ।

আমি আজ ওকে চা দিইনি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বিদায় করে দিয়েছি।

কী করে তাড়ালে?

সুপ্রিয়া সবিস্তারে ঘটনাটি খুলে বলল।

সিদ্ধার্থ আফসোসের সুরে বলল, ইস্‌, বেচারাকে তাড়িয়ে দিলে! তোমার এলেম আছে বলতে হবে…মাত্র দু'দিনেই। রমেনের বউ রত্না কিন্তু দু'মাসের মধ্যেও ওকে কিছু বলতে পারেনি।

আমি রত্নার মতন অমন ভালোমানুষ নই।

শশাটা এমনিতে খুব নিরীহ। বিয়ে-টিয়ে করেনি, নিরালায় সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে গল্প করাটা ওর নেশা। সুন্দরী মেয়েদের ও মনে মনে পুজো করে।

বিয়ে করেনি কেন?

খুব সুন্দরী মেয়ে ছাড়া ওর অন্য কোনো মেয়ে পছন্দ নয়। আমাদের একদিন বলেছিল। যে সে মেয়েকে ও বিয়ে করবে না। খুব সুন্দরী মেয়ে ওর মতন একটা লোককে বিয়ে করবেই বা কেন? তাই বেচারার বিয়েই করা হল না।

ইস্, ঐ চেহারায় আবার সুন্দরী বিয়ে করার শখ! ও বুঝি নিজের চেহারা কোনো দিন আয়নায় দেখেনি?

ও কথা বলো না। দ্যাখ, দুর্গাঠাকুর কিংবা সরস্বতী পুজো করে কারা? অধিকাংশই তো রোগা, সিড়িঙ্গে, বিচ্ছিরি চেহারার পুরুষ। দেবীরা খুব রূপসী, তা বলে পূজারীকেও যে সুন্দর হতে হবে, তার তো কোনো মানে নেই। ও আগে প্রত্যেক দিন দুপুরের শো-তে হিন্দী সিনেমায় যেত, সুন্দরী অভিনেত্রীদের দেখবার জন্য। এখন বোধ হয় জ্যান্ত সুন্দরীদের দেখতে চায়।

আমার কাছে আর আসবে না। রোজ রোজ দুপুরে ও সব ন্যাকামো আমার ভালো লাগে না। দুপুরে একটু পড়াশুনো করি।

সুপ্রিয়া ফিলসফিতে এম এ. পাস। আজকাল অবশ্য তার পড়াশুনা বিলিতি হালকা গল্পের বইতেই সীমাবদ্ধ।

সিদ্ধার্থ পাশ ফিরে ঘুমোবার আগে বলল, দেখ, ও ঠিক আর একটা কোনো ছুতো খুঁজে আসবে। তোমাকে ওর খুব পছন্দ। আমি আগেও লক্ষ্য করেছি, তোমার নাম শুনলেই ওর মুখখানা কেমন গদগদ হয়ে যায়।

পরদিন দুপুরে সুপ্রিয়া আবার দরজায় খুট খুট শব্দ শুনল। সেদিনও লোডশেডিং। রীতিমত রেগে গেল সুপ্রিয়া। আজ আর শশধরকে ভেতরে ঢুকতেই দেওয়া হবে না। দরজার কাছ থেকেই তাকে কড়া কথা বলে বিদায় দিতে হবে। হাউস কোটটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সুপ্রিয়া এসে দরজা খুলল। কেউ নেই।

সুপ্রিয়া বাইরে বেরিয়ে এদিক ওদিক দেখল। কই, কেউ নেই তো? কোনো দুষ্টু ছেলে দরজায় টোকা দিয়ে পালিয়েছে। আগে তো কোনো-দিন এ রকম হয়নি! তা হলে কি সুপ্রিয়ার মনের ভুল! কেউ টোকা দেয়নি! আশ্চর্য!

দরজা বন্ধ করে কাছেই দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়া একটুক্ষণ অপেক্ষা করল, না, আর কেউ টোকা দিল না। বিনা কারণে সুপ্রিয়া একবার রাস্তার দিকের বারান্দাটাতেও ঘুরে এলো। রাস্তায় কেউ নেই।

এমন ভুল করার জন্য সুপ্রিয়া নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠল।

হাউস কোটটা খুলে সবেমাত্র বিছানায় শুয়েছে। আবার দরজায় টোকা। সুপ্রিয়া উৎকর্ণ হয়ে রইল। এবারেও মনের ভুল?

এরপর বেশ জোরে শব্দ হল দরজায়। এটা কিছুতেই মনের ভুল হতে পারে না।

ফের এসে রাগত ভঙ্গিতে দরজা খুলেই সুপ্রিয়ার মুখটা খুশির হাসিতে

ভরে গেল। দরজার সামনে অপরাধীর মতন মুখ করে দাঁড়িয়ে রঘু। ওদের রান্নার লোক।

খুশির চোটে তাকে বকুনি দিতেও ভুলে গেল সুপ্রিয়া। স্নেহের স্বরে বলল, তোরা কী করিস? এমন চিন্তায় ফেলিস! আমি ভাবলুম, দেশে গিয়ে তোর আবার কোনো অসুখ বিসুখ হল নাকি!

রঘু কোনা উত্তর দিল না।

আয় ভেতরে। কী হয়েছিল?

রঘু আমতা আমতা করে বলল, এবার দেরিতে বৃষ্টি হল. জমিতে ধান রোওয়া বাকী ছিল·

ধান রোওয়া-টোওয়ার ব্যাপার সুপ্রিয়া কিছু বোঝে না। রঘু ওকে যা খুশি মিথ্যে বুঝিয়ে দিতে পারে। কিন্তু খুশির আতিশয্যে সে-সব ভুলে গিয়ে সুপ্রিয়া বলল, ইস্! ক'দিনেই দেশে গিয়ে এমন রোগা হয়েছিস? ওখানে ভালো করে খেতে পেতিস না বুঝি? রান্নাঘরে দ্যাখ আলুর দম আর রুটি আছে। খেয়ে নে।

সুপ্রিয়ার স্বস্তির কারণ, রঘু এসে গেছে। আর তাকে নিজে এসে দরজা খুলতে হবে না। এই যে ধোপা কিংবা ডিমওয়ালা কিংবা ঠিকে ঝি এলেও সুপ্রিয়াকে গিয়ে দরজা খুলতে হয়েছে এই ক'দিন, এটা তার কাছে বিরক্তিকর।

সুপ্রিয়া নিজের ঘরে ফিরে এলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল পাখা। রঘু আসার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেছে সুসময়।

একটু পরে বেজে উঠল কলিং বেল।

এখন তো বাবলুর ফেরার সময় হয়নি! তা হলে কি—

সুপ্রিয়া শুয়ে শুয়েই টের পেল, রঘু দরজা খুলে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে।

কে রে, রঘু?

রঘু বলল, ইস্ত্রিরওয়ালা। যে জামা কাপড় মেলা ছিল আমি দিয়ে দিচ্ছি—

যাক, রঘু এসে গেছে, এখন সব নিশ্চিন্ত। রঘুই সব ব্যবস্থা করবে।

রঘুকে বলে দিতে হবে, দুপুরবেলা যে-সে এসে দরজায় ধাক্কা দিলে রঘু যেন জানিয়ে দেয়, বাড়িতে কেউ নেই। চেনা লোক হলেও রঘু যেন হুট করে তাকে ভেতরে না ঢুকতে দেয়।

পরদিন কিংবা তার পরদিনও শশধর আর এলো না।

কিন্তু পরের শনিবার সুপ্রিয়া তার দিদির সঙ্গে নিউ মার্কেটে শাড়ি কিনতে গেছে, হঠাৎ দেখল একটা স্টলের পাশে শশধর দাঁড়িয়ে। সুপ্রিয়ার দিকে তার পিঠ ফেরানো। সে যেন সুপ্রিয়াকে দেখছে না। দোকানের জিনিস দেখছে খুব মন দিয়ে। সুপ্রিয়া ওকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেল।

ফেরার পথে সুপ্রিয়ার মনে একটা খটকা লাগল। ঐ শশধরটা কি ওখানে

হঠাৎ গেছে ? পুরুষ মানুষ দুপুরবেলা নিউ মার্কেটে একলা একলা ঘুরে বেড়ায় ? অথবা সে জানে যে সুপ্রিয়া ওখানে যাবে ? কি করে জানল ? শশধর ওদের বাড়ির কাছ থেকে অনুসরণ করেছে ?

যাক গে, এটা এমন কিছু মাথা ঘামাবার ব্যাপার নয়, এই ভেবে সুপ্রিয়া চিন্তাটাকে উড়িয়ে দিল।

দুপুরবেলা কলিং বেল বাজলেই কিংবা দরজায় খুটখাট শব্দ হলেই সুপ্রিয়া চমকে চমকে ওঠে। প্রতিদিনই কেউ না কেউ আসে। ধোপা কিংবা কোনো ফেরিওয়ালা কিংবা পাশের ফ্ল্যাটের কেউ। আগেও যে প্রায় দুপুরেই এ রকম কেউ না কেউ আসত, সুপ্রিয়ার যেন মনেই ছিল না।

একদিন সকাল এগারোটায় সুপ্রিয়া লেডিজ কর্ণার থেকে তার অর্ডারি ব্লাউজ ও শায়া আনতে গেছে, দেখল যে পাশের পানের দোকানের সামনে ধুতি ও নীল রঙের শার্ট পরা একজন রোগা, চিমসে চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা খয়েরি হয়ে আসা ছাতা। খুব মন দিয়ে দেশলাই কিনছে শশধর।

সুপ্রিয়া না-দেখার ভান করে দোকানের মধ্যে ঢুকে গেল। এই দোকানটা শুধু মেয়েরাই চালায়। লোকটা এখানে এই মেয়েদের দেখতে আসে ? সকাল এগারোটায় ? অফিসে যাওয়া কি একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে ? এই দোকানের কোনো মেয়েকেই তো খুব সুন্দরী বলা যায় না—

সে দোকানে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগল সুপ্রিয়ার। মাপ-টাপ মিলিয়ে নেবার ব্যাপার আছে।

যখন সে দোকান থেকে বেরুল, তখন চকিতে একবার দেখে নিল, শশধরের এখনো যেন দেশলাই কেনা শেষ হয়নি। সেই একই ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে।

শশধর একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালো সুপ্রিয়ার দিকে।

কিন্তু চোখাচোখি হবার আগেই সুপ্রিয়া উঠে পড়ল একটা রিক্শায়। সুপ্রিয়ার হাসিও পায়, রাগও হয়। এ কি শুরু করেছে লোকটা ? পাগল হয়ে গেছে নাকি ? সুপ্রিয়ার যেন মনে পড়ছে, এর মধ্যে আরও কয়েকবার সে শশধরকে তার কাছাকাছি ঘোরাফেরা করতে দেখেছে। লোকটা সব সময় তাকে অনুসরণ করে ? কিন্তু এজন্য রাস্তার মাঝখানে তো ওকে গিয়ে ধমক দিতে পারে না।

মেট্রো সিনেমায় ছবি ভাঙার পর ওপরের সিঁড়ি দিয়ে সুপ্রিয়া তার দিদি ও দুই বান্ধবীর সঙ্গে নামছে, এমন সময় সে বলে উঠল, এই রে!

সিঁড়ির নিচে কাঁচের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে শশধর। সেই একই রকম পোশাক, ক'দিন ধরে বৃষ্টির নাম গন্ধ নেই, তবু হাতে সেই ছাতা। করুণ, তৃষ্ণার্ত চোখ মেলে চেয়ে আছে সুপ্রিয়ার দিকে।

দিদি জিজ্ঞেস করল, কি হল ?

সুপ্রিয়া বলল, কিছু না। ভাবছিলাম, বুঝি চাবিটা ফেলে এসেছি।

না। ব্যাগের মধ্যে আছে।

দিদি কিংবা বান্ধবীদের কাছে কথাটা বলা যায় না। ওরা নিশ্চয়ই হাসি-ঠাট্টা করবে।

শশধর কিন্তু সরে গেল না। সুপ্রিয়ারা নিচে নেমে যখন কাঁচের দরজা পেরিয়ে যাচ্ছে, তখনও সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সুপ্রিয়ার দিকে। যেন তার উষ্ণ নিশ্বাস এসে লাগল সুপ্রিয়ার ঘাড়ে। সুপ্রিয়া মুখখানাকে সোজা রাখল, ওর দিকে একবারও তাকাল না।

যখন সঙ্গে সিদ্ধার্থ থাকে, কিংবা জামাইবাবু কিংবা যে কোনো পুরুষ মানুষ, তখন কিন্তু শশধরকে কক্ষনো দেখা যায় না। সে সুপ্রিয়াকে একা দেখতে চায়। কিংবা অন্য মেয়েরা সঙ্গে থাকলেও ক্ষতি নেই। এটা সুপ্রিয়া লক্ষ্য করেছে। কিন্তু রাস্তায় বেরুলেই যদি মনে হয়, দূর থেকে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে, তাহলে খুব অস্বস্তি লাগে না? এর একটা প্রতিকার করা দরকার। এ ব্যাপারটা সিদ্ধার্থকে বলবে কি বলবে না, সুপ্রিয়া মনস্থির করতে পারে না। সিদ্ধার্থ হয়ত হেসে উঠবে। যা হালকা স্বভাব ওর।

একদিন মুখোমুখি হয়ে গেল।

সুপ্রিয়ার পরনে গাঢ় লাল শাড়ি। পায়ে লাল চটি, মাথায় লাল ছাতা। তার গৌরবর্ণ এই রক্তিম আভরণে যেন সোনার মতন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সুপ্রিয়ার দিকে রাস্তায় অনেক মানুষই তাকায়। সেটা সুপ্রিয়ার ভালোই লাগে, কিন্তু একজন বিশেষ কেউ তাকিয়ে থাকলেই আর স্বাভাবিক হওয়া যায় না।

গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে দিয়ে হাঁটছে সুপ্রিয়া, বিকেল পৌনে ছ'টা, আকাশটাও তার পোশাকের মতন রক্তবর্ণ, সেই সময় উল্টো দিক থেকে ঠিক মুখোমুখি হেঁটে এলো শশধর। চোখে সেই একই রকম করুণ, তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি!

সুপ্রিয়া থমকে দাঁড়িয়ে সোজা তাকাল ওর দিকে।

শশধর আরও দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল। তার মুখে যেন আলো ফুটে উঠেছে। সুপ্রিয়ার মুখে সে হাসি দেখতে পেয়েছে।

একেবারে কাছাকাছি এসে সে কথা বলার জন্য সবে ঠোঁট ফাঁক করেছে, সুপ্রিয়া সেই সময় তার পোশাকের মতন চোখও রক্তবর্ণ করে ফেলল, তারপর দারুণ ঘৃণার সঙ্গে বলল, ছিঃ!

ঐ একটি মাত্র শব্দ, আর কিছু না। তারপরই সুপ্রিয়া ডানদিকে ফিরে একটা রিক্শা ডাকল। রিক্শায় উঠে আর একবারও পিছন ফিরে তাকাল না পর্যন্ত।

ইচ্ছে করেই একটু বেশি খারাপ ব্যবহার করতে হল সুপ্রিয়াকে। ঐ লোকটাকে আর বেশি প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। দিনের পর দিন পথে ঘাটে একজন লোককে নিয়ে ঘোরা, এ যেন একটা দারুণ বোঝা। এ অন্য কেউ বুঝবে না। সবাই শুনলে বলবে, এতে আর এমন কি হয়েছে, লোকটা তো কোনো ক্ষতি করে না।

কিন্তু এ যে এক সাঙ্ঘাতিক মানসিক চাপ। সব সময় একটা লোক তাকিয়ে থাকবে? ওর লোভী দৃষ্টি যেন সুপ্রিয়ার পিঠে ফোটে।

আজ একটু হেসে কথা বললেই আর কোনো উপায় ছিল না। আবার ঠিক বাড়িতে আসতে আরম্ভ করত! এরা এক ধরনের রোগী. এদের শিক্ষা দেওয়া দরকার সেই জন্যই সুপ্রিয়া আজ ইচ্ছে করে বেশি সাজগোজ করে বেরিয়েছিল।

ক'দিন বাদে রাস্তায় বেরিয়ে সুপ্রিয়ার মনে হল তার শরীরটা যেন বেশ হাল্কা হয়ে গেছে। মেজাজটাও ভালো লাগছে। সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল। না, শশধর কোথাও নেই। সত্যিই নেই। সুপ্রিয়া ঠিক বুঝতে পেরেছে।

তারপর আর কোনো দিনই শশধরকে দেখা গেল না।

রাস্তায় এমনিই তো মানুষের সঙ্গে মানুষের হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। শশধরের সঙ্গে সে রকমও দেখা হয় না কখনো। সুপ্রিয়ার পথ থেকে শশধর নিজেকে যেন সম্পূর্ণ সরিয়ে ফেলেছে। যাক নিশ্চিন্ত!

নিছক কৌতূহলেই সুপ্রিয়া একদিন তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সেই বন্ধুর কি খবর? ঐ যে শশধর না কি যেন নাম? তোমাদের তাসের আড্ডায় আর আসে-টাসে না?

সিদ্ধার্থ বলল. শশা? না, সে তো আর অনেক দিনই আসে না। সবাই মিলে ওর পেছনে খুব লাগা হত তো। রমেন বলেছিল, ওরে শশা, ইংলণ্ডের রাজকুমারীর ডিভোর্স হয়েছে তুই তাকে বিয়ে করবি নাকি?. বল তা হলে সম্বন্ধ করি।

যাঃ. একটা নিরীহ লোককে নিয়ে তোমরা এ রকম নিষ্ঠুর রসিকতা কর।

নিরীহ ভালোমানুষদেরই তো পিছনে লাগে সবাই। আমাকে নিয়ে কি কেউ ও রকম বলতে পারবে?

আর আসে না?

নাঃ! একদম যেন হারিয়েই গেছে। আগে বলত, আমি ভাই ব্যাচেলার মানুষ, সন্ধের পর সময় কাটে না। তাই তোমাদের কাছে আসি। তাস খেলায় ওকে নেওয়া হত না. তবু চুপচাপ বসে থাকত। হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

এরপর শশধর মুছে গেল ওদের জীবন থেকে। তবে, পেন্সিলের লেখাও ইরেজার দিয়ে খুব ভালো করে মুছলেও একটু না একটু সূক্ষ্ম দাগ থেকে যায়।

রাস্তায় বেরিয়ে সুপ্রিয়া এখনো হঠাৎ পিছন ফিরে তাকায়। সেই শুকনো মুখওয়ালা মানুষটা চট করে কোথাও সরে পড়ল না তো? পানের দোকানের পাশ দিয়ে একটা ছায়া সরে গেল না? কিন্তু না, এ সব ব্যাপার বুঝতে ভুল হয় না। মেয়েদের পিঠেও চোখ থাকে।

সুপ্রিয়া মাঝে মাঝেই ভাবে, লোকটা গেল কোথায়?

পরক্ষণেই সে ভাবে, এ কি, আমি লোকটার কথা ভাবছি কেন? লোকটা

গেছে, বাঁচা গেছে ! কম জ্বালান জ্বালিয়েছে এই ক'মাস !

দুপুরবেলা কেউ কলিং বেল বাজালে সুপ্রিয়া এখনো চমকে চমকে ওঠে। সুপ্রিয়া যেন শশধরের জন্য প্রতীক্ষাই করে। লোকটা যে সত্যিই আর আসবে না কিংবা রাস্তায় অনুসরণ করবে না, সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবে, এটা সুপ্রিয়ার কাছে এখনো অবিশ্বাস্য মনে হয়।

একদিন নির্জন দুপুরে আবার বেল বাজে। দরজা খুলে দেয় রঘু। অচেনা বা অল্প চেনা লোক হলে দুপুরে ঢুকতে দেওয়া হবে না, এ রকম নির্দেশ আছে রঘুর ওপর। কিন্তু একজন অচেনা আগন্তুক রঘুকে গ্রাহ্যই না করে দরজা খোলামাত্র সরাসরি ভেতরে ঢুকে পড়ে করুণ গলায় ডাকে, সুপ্রিয়া ! সুপ্রিয়া !

সেই ডাক শুনে সুপ্রিয়ার বুক ধড়াস ধড়াস করে ওঠে। খাট থেকে নেমে ড্রেসিং গাউন পরতে ভুলে গিয়ে, প্রায় দৌড়েই নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সে ! তারপর থমকে গিয়ে বলে, তুমি ?

সব সুন্দরী রমণীদেরই একাধিক প্রেমিক থাকে। রূপের কিছু স্তাবক না থাকলে রূপ কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। শুধু নিজের স্বামীর জন্য কোনো বিবাহিতা রমণী বছরের পর বছর রূপচর্চা বা সৌন্দর্যচর্চা করে ? মেয়েরা প্রসাধন করে বাইরে বেরুবার সময়।

চেনাশুনোদের মধ্যে সুপ্রিয়ার চার পাঁচজন ঘনিষ্ঠ স্তাবক আছে বটেই, তা ছাড়া আছে একজন বাল্য প্রেমিক।

সেই সব মেয়েরাই ভাগ্যবতী, যাদের একজন বাল্য প্রেমিক থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে বিয়ে হয় না, বিয়ে হয় একজন বেশ স্বাস্থ্যবান, সচ্ছল, নির্ভরযোগ্য মানুষের সঙ্গে, তারপর বাকি জীবন সেই বাল্য প্রেমিকটির সঙ্গে কাছাকাছি বা দূরত্বে একটি মধুর সম্পর্ক থেকে যায়। সুপ্রিয়া সেই রকম ভাগ্যবতী।

তার বাল্য প্রেমিকটির নাম অভিজিৎ। সব দিক থেকেই রোমান্টিক প্রেমিক হবার যোগ্যতা আছে তার। সে শুধু সুদর্শন নয়, তাকে দেখা যায় খুব কম। সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য চাকরির কারণে। এবং সে বিয়ে করেনি।

অভিজিৎ আসে ন'মাসে ছ'মাসে একবার। এবার এলো ঠিক পৌনে দু'বছর পর।

সুপ্রিয়া খুশি ও অভিমান মিশিয়ে জিজ্ঞেস করল, মনে আছে, তা হলে ?

চিঠি লেখার অভ্যেস নেই অভিজিতের। তা ছাড়া চিঠি লেখার অসুবিধেও আছে। সে বলল, তুমি জানতে না, আমি বাঙ্গালোরে আছি এখন ?

অভিজিতের সঙ্গে একটা ক্ষীণ সূত্র আছে যোগাযোগের। অভিজিতের মাসতুতো বোন স্বপ্না আবার সুপ্রিয়ার বান্ধবী। তবে স্বপ্নার সঙ্গেও আজকাল বেশি দেখা হয় না আর দেখা হলেও সুপ্রিয়া মুখ ফুটে তার কাছে অভিজিতের কথা জিজ্ঞেস করতে পারে না !

বাঙ্গালোর বুঝি পৃথিবীর ওপারে? সেখান থেকে এতদিন পর পর আসতে হয়?

অভিজিৎ বলল, সত্যিই এর মধ্যে একবারও কলকাতায় আসতে পাইনি। তুমি কেমন আছ ?

কেমন দেখছ ?

আগের চেয়েও সুন্দর।

অভিজিৎ পূজারী নয় এবং নিছক স্তাবক। সে বাল্য প্রেমিক। বাল্য প্রেমিকরা হিংস্র হয়, শুধু মুখের কথা নয়, তারা আরো অনেক কিছু চায়।

'আগের চেয়েও সুন্দর' কথাটা উচ্চারণ করে অভিজিৎ গাঢ়ভাবে বেশ কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে সুপ্রিয়ার দিকে। তারপর সে বলে, আমাকে কি বসতে বলবে না ?

তোমার সঙ্গে ভদ্রতা করতে হবে বুঝি ?

অভিজিৎ একটা চেয়ারে বসে পড়ে আর একটা চেয়ার টেনে কাছে এনে বলে, তুমি বস এটাতে।

সুপ্রিয়া তবু দাঁড়িয়ে থাকে। সে দেখে অভিজিতের মাথায় গুচ্ছ গুচ্ছ কোঁকড়া চুল ঠিক দশ বছর আগে যেমন ছিল, এখনো সেই রকমই আছে।

অভিজিতের ব্যবহার অত্যন্ত সাবলীল। সে সুপ্রিয়ার উরুতে ডান হাতের পুরো পাঞ্জাটা রেখে বলে, এসো আমার কাছে এসে একটু বস।

যেন আগুনের স্পর্শ লেগেছে, এইভাবে ভয় পেয়ে সুপ্রিয়া ছিটকে সরে যায়। চোখ দিয়ে সে ভর্ৎসনা করে অভিজিৎকে। অভিজিতের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। রঘু আছে না ?

অভিজিৎ লজ্জা না পেয়ে হাসে।

রঘু দুপুরবেলা দরজার কাছে যেখানে শুয়ে থাকে, সেখান থেকে বসবার ঘরের কথাবার্তা ঠিক শোনা যায় না। কিন্তু রঘু যদি এখানে হঠাৎ এসে পড়ে ? সুপ্রিয়া কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চায় না। অভিজিৎ যদি আগে খবর দিত তাহলে সুপ্রিয়া একটা কিছু ব্যবস্থা করত। সবচেয়ে সুবিধে, বাইরে কোথাও দেখা করা।

দুপুরবেলা আগন্তুক সম্পর্কে যাতে রঘুর কোনো কৌতূহল না জাগে সেই জন্য সুপ্রিয়া সাড়ম্বরে রঘুকে ডেকে বলল, রঘু, দু' কাপ চা করে দে তো। কিংবা কফি থাকলে কফি করে দে !

রঘু যতক্ষণ কফি বানায়, ততক্ষণ অভিজিৎ টুকিটাকি কথা বলে সুপ্রিয়ার সঙ্গে। কিন্তু তার ভেতরটা ছটফট করে। অনেক দিন পর, অনেক দূর থেকে এসে দেখা করলে তার একটুও দূরত্ব পছন্দ হয় না। সুপ্রিয়া কেন অত দূরে বসে আছে ?

রঘু কফি দিতে এলে অভিজিৎ প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে বলে, যাঃ, সিগারেট আনতে ভুলে গেছি। তারপর সে রঘুর দিকে চেয়ে মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করে. ভাই, এক প্যাকেট সিগারেট এনে দিতে পারবে ?

সুপ্রিয়া তীক্ষ্ণভাবে প্রশ্ন করে, কেন, কাছে সিগারেট নেই ?

না, একদম ভুলে গেছি।

তাহলে আর সিগারেট নাই বা খেলে! এখন খেতে হবে না।

চা কিংবা কফি খাওয়ার পর সিগারেট না পেলে চলে? আজকাল অনেক কমিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কফির পর একটা—

সুপ্রিয়া শোবার ঘরে খুঁজতে গেল। এবং সত্যিই সিদ্ধার্থর কোনো সিগারেট খুঁজে পেল না। একটা প্যাকেট আছে, তা-ও খালি।

ততক্ষণে অভিজিৎ টাকা বার করে ফেলেছে। সুপ্রিয়া ফিরে আসা মাত্র সে টাকাটা রঘুকে দিয়ে বলল, ভাই, চট করে এক প্যাকেট নিয়ে এসো। কাছেই দোকান আছে না ?

রঘু দরজা টেনে বেরিয়ে গেল। এ এমনই দরজা, একবার টেনে দিলে বন্ধ হয়ে যায়, বাইরে থেকে খোলা যায় না।

রঘু বাইরে যাওয়া মাত্র অভিজিৎ লাফিয়ে উঠল।

অভিজিতের আলিঙ্গনের মধ্য থেকে চুম্বন ভেজানো ঠোঁটে সুপ্রিয়া বলল, শোন, তোমাকে আমি শশধর বলে ডাকব!

অভিজিৎ ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করল, শশধর? সে কে?

কেউ নয় ?

হঠাৎ ঐ বিদঘুটে নামটাই বললে কেন ?

এমনিই। বিদঘুটে কেন হবে, শশধর মানে চাঁদ। চাঁদও তো তোমারই মতন। রোহিণীকে ভুলে থাকে।

তুমি বুঝি রোহিণী ?

সময় খুব কম, রঘু এক্ষুনি ফিরে আসবে, তাই, অভিজিৎ খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সেই অবস্থার মধ্যেও সুপ্রিয়া মনে মনে একটা সংলাপ তৈরি করে রাখে।

সাবধানতার জন্য আজ রাত্রেই সে খাওয়ার টেবিলে তার স্বামীকে হাসতে হাসতে বলবে. আজ দুপুরে তোমার সেই বন্ধু হঠাৎ আবার এসে হাজির হয়েছিল।

ঐ যে শশধর না কি যেন নাম ?

নাম নেই

দেখতে গিয়েছিলাম জঙ্গল, দেখে এলুম অন্য অনেক কিছু। সেই জঙ্গলে অনেক রকম ফুল ফুটেছিল, কত ফুলের নাম জানি না, কিন্তু সেখানকার কোনো বিশেষ ফুলের কথা আমার মনে নেই, মনে আছে শুধু একটি কিশোর বয়েসী ছেলের মুখ!

ব্যাপারটা এখনো আমার কাছে রহস্যময় লাগে।

ছেলেটিকে আমি দেখেছিলাম বড় সুন্দর একটা পরিবেশে। এইসব দৃশ্য আমরা ছবিতে দেখি। কিংবা নিজেরা যখন এই দৃশ্যের মধ্যে উপস্থিত হই, তার চেয়েও বেশী ভালো লাগে যখন পরে সেই দৃশ্যটার কথা ভাবি।

খুব ঘন জঙ্গলের মধ্যে সেখানে জায়গাটা একটু ফাঁকা। চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়, মাঝখানে খানিকটা ঢালু উপত্যকা, সেখানে একটা লাল রঙের নদী। 'সবুজ বন, রক্ত নদী.' এরকম বলা যেতে পারতো, আসলে নদীটি একটি খুবই ছোট ঝর্ণা। লাল রঙের মাটি ধুয়ে ধুয়ে আসে বলে জলের রং ঠিক রক্তবর্ণ নয়। অনেকটা গেরুয়া গেরুয়া।

দুপুরের ঝলমলে রোদ, অথচ গরম নেই দুদিন খুব টানা বৃষ্টির পর সেদিন রোদ উঠেছে, এই সব দিনে মন খুব ভালো লাগে।

আমরা নদীটা পেরিয়ে এবং একটা ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে একটা মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। শুনেছিলাম, সেখানে নরবলি হয়। কথাটা শুনে অবশ্য আমরা খুবই অবিশ্বাস করেছিলুম। নরবলি? এই যুগে? হয়তো অতীত কালে কখনো হতো। স্থানীয় দু'একজন লোককে জিজ্ঞেস করেছি, তারা হ্যাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। কেউ কেউ আকাশের দিকে মুখ করে বলেছে, কী জানি! এটা অবশ্য কোনো দূর-দুর্গম অঞ্চলের কাহিনী নয়, এই জায়গাটা মাত্র দেড়শো কি দুশো মাইল দূরে, মেদিনীপুরে।

মন্দিরটি জনশূন্য। খুবই ছোটখাটো ব্যাপার, সামনে একটা কাঠগড়া, খুব সম্ভবত সেখানে পাঁঠা কিংবা মোষ বলি হয়। খানিকটা টাটকা রক্ত এখনো পড়ে আছে।

ফেরার পথে আমরা লাল রঙের ঝর্ণাটার পাশে একটু বসলুম। আমরা অর্থাৎ আমরা দুই বন্ধু এবং বাংলোর চৌকিদার। সে-ই আমাদের গাইড।

যাবার পথেও দেখেছিলুম যে ঝর্ণাটার পাশে কতকগুলি ছাগল চরছে, আর সেগুলিকে পাহারা দিচ্ছে একটি ছেলে। বছর দশ এগারো বয়েস। রাখাল গরু চরায়, কিন্তু যে ছাগল চরায়, তাকেও কি রাখাল বলা যায়?

পরনে একটা ইজের, খালি গা। ছেলেটি ছপ ছপ করে ঝর্ণা পেরিয়ে এদিকে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আমার বন্ধু বললে, ছেলেটির মুখখানা ভারি সুন্দর দেখতে না?

আমি হাতছানি দিয়ে ছেলেটিকে ডাকলুম।

ছেলেটি অপলকভাবে তাকিয়েই রইলো, কোনো সাড়া দিল না। কাছেও এলো না।

চৌকিদারকে বললুম, ওকে ডাকো তো!

চৌকিদার ধমকের ভঙ্গিতে একটা হাঁক দিল, তাতে ছেলেটির মুখে একটু হাসি ফুটল শুধু, কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

ছেলেটা খুব গোঁয়ার। আমরা অনেকবার ডাকাডাকি করতেও সে গ্রাহ্যই করলো না।

আমি চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি চেনো ওকে?

চৌকিদার বললো, ও তো মহাদেব মাহাতোর ভাতুয়া!

তখনই জিজ্ঞেস করিনি, তবে ভাতুয়া কথাটার মানে পরে জেনেছিলাম।

আমি আবার ছেলেটিকে বললাম, এই, তোর নাম কী রে? তুই ডাকলে আসিস না কেন?

ছেলেটি তবু উত্তর দিল না। আমার বন্ধু বললো, আমরা শহরের লোক তো, তাই ও আমাদের দেখে ভয় পাচ্ছে।

আমি চৌকিদারকে বললুম, ও আমাদের দেখে ভয় পাচ্ছে কেন? আমরা কি ওকে খেয়ে ফেলবো? ওর নাম কী?

চৌকিদার বললো, স্যার, ওর নাম নেই। ও বোবা, কথা বলতে পারে না, তাই ওর নাম কেউ দেয় নি। সবাই ছোঁড়া ছোঁড়া বলে। কেউ কেউ শুধু বোবা বলেই ডাকে।

আসবার সময় মনে হয়েছিল এই জঙ্গল খুব গহন, নিবিড়, নির্জন। আসলে জঙ্গলটি বেশ গভীর হলেও নির্জন নয়। ফাঁকে ফাঁকে অনেক মানুষজন বাস করে। কিছু কিছু চাষবাসও হয়। এই জঙ্গলে বাঘ নেই, তবে বাঘের চেয়ে অনেক বড় আকারের জানোয়ার আছে।

লাল রঙের ঝর্ণার পাশে ছাগল চরানো কিশোরটির সঙ্গে আমার একটু কথা বলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সে বোবা শুনে একটু মন খারাপ হয়ে গেল। বোবা বলেই বোধ হয় ও মানুষের কাছে আসে না।

আমরা যেই উঠে পড়লুম, অমনি ছেলেটি ঝর্ণা পেরিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। অনেক দূরে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগলো।

আমাদের। যেন ও লুকোচুরি খেলছে।

বাংলোয় ফিরে এলাম খিদের টানে।

সেদিনই সন্ধেবেলা বেশ কিছু লোকের উত্তেজিত গলার আওয়াজ পাওয়া গেল বাংলোব সামনে।

কিছু কিছু জঙ্গলের মানুষ জানতে এসেছে যে আমাদের কাছে বন্দুক আছে কিনা। আমরা জিপে করে এসেছি বলে ওরা আমাদের হোমরাচোমরা কেউ ভেবেছে। আমি জীবনে কখনো, খুব শখ থাকা সত্ত্বেও, বন্দুক ছুঁয়েই দেখিনি।

বন্দুক দরকার হাতি তাড়াবার জন্য।

প্রত্যেকবারই এইখানে একপাল হাতি আসে ফসল খাবার জন্য। এ বছর খরা, তাই জমিতে এখনও ফসল বোনা হয় নি, সেই জন্য হাতিরা এসে ফসল নষ্ট করার সুযোগ না পেয়ে ক্ষেপে গেছে।

অন্য বছর টিন পিটিয়ে এবং মশাল ছুঁড়ে হাতির পালকে তাড়ানো হয়, এ বছর তাতেও হাতিরা যাচ্ছে না। তারা তাদের খাদ্য পায় নি।

কাছাকাছি কোথাও হাতি এসেছে শুনে রোমাঞ্চ লাগে। শহুরে মানুষ জঙ্গলে এসে সত্যিকারের জংলী জানোয়ার দেখতে চায়।

আমরা তক্ষুনি উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিলুম। কিন্তু চৌকিদার আমাদের উৎসাহে বাধা দিয়ে বললে, আজ আর রাত্তিরের দিকে যাবেন না, স্যার। সকালে যাবেন।

সে আমাদের কিছুতেই বেরুতে দেবে না সন্ধেবেলা। তার তো একটা দায়িত্ব আছে।

বাংলোর সামনে কিছু লোক তখনও জটলা করছে। আমরা সেখান থেকে চলে গিয়ে বাংলোর পেছন দিকে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়ালুম। সেখান থেকে হাতি দেখা না গেলেও তাদের ডাক যদি অন্তত শোনা যায়।

কিছুই শোনা গেল না অবশ্য। খানিক বাদে ফিরে এলুম বাংলোয়। অন্য লোকেরাও চলে গেছে।

চৌকিদার বললো, একজনকে পাঠানো হয়েছে বাঁশপাহাড়ীতে। থানায় খবর দেবার জন্য। গভর্ণমেন্ট কোনো ব্যবস্থা না করলে হাতির উপদ্রবে অনেক ঘর বাড়ি এবার নষ্ট হবে। তিনটে হাতি এসেছে, কিছুতেই যাচ্ছে না।

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এই রাত্তিরবেলা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একা একজন গেল? সাহস আছে তো লোকটার? কে গেল?

চৌকিদার বলল, ঐ গুরু মুখিয়ার ভাতুয়া গনাই।

আমি বললুম, লোকটা অন্ধকারের মধ্যে একা একা গেল, যদি হাতির সামনে পড়ে যায়? ওকে তো হাতিরা মেরে ফেলতে পারে।

চৌকিদার এ কথার কোনো উত্তর দিল না।

হাতির গল্প নয়, এটা ভাতুয়ার কাহিনী।

তখন আমি জিজ্ঞেস করলুম, বারবার ভাতুয়া ভাতুয়া শুনছি। ভাতুয়া মানে কী?

তখন আমাদের বোঝান হলো যে ভাতুয়া এক ধরনের ক্রীতদাস। শুধু ভাত খাওয়ার বিনিময়ে তারা কোনো বাড়িতে কাজ করে। খেতে পায় বলে তারা সব রকম কাজ করতে বাধ্য, এমন কি রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে থানায় খবর দেওয়া পর্যন্ত।

এর পরের খবরটি আরও চমকপ্রদ।

সকালে যে ছাগল-চরানো কিশোরটিকে দেখেছিলুম, সে এই ভাতুয়ারই ছেলে। ভাতুয়ার ছেলেও ভাতুয়া।

যে লোক শুধু ভাতের বিনিময়ে এক বাড়িতে জীবন বাঁধা দেয়, তারও স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি আছে? কিসের ভরসায় সংসার পাতে?

—ওর ছেলে ভাতুয়া, আর ওর বউ?

—সেও আর এক বাড়িতে ভাতুয়া।

—ওদের কোনো নিজস্ব বাড়ি আছে?

—কী করে থাকবে, স্যার? ভাতুয়াদের চব্বিশ ঘন্টা থাকতে হয়। ঐ গনাইয়ের এক টুকরো জমি আর বাড়ি ছিল, মেয়ে বিয়ে দেবার সময় বিক্রি হয়ে গেছে।

আমি চুপ করে রইলুম। বাড়ি নেই, সংসার নেই, তবু একটা পরিবার আছে। মাঝে মাঝে দেখা হয় নিশ্চয়ই ওদের। তখন কী কথা হয়?

লাল রঙের ঝর্ণার পাশের সেই কিশোরটির কথা আমার মনে পড়তে লাগলো বারবার। বোবা বলে তার একটা নামও দেওয়া হয় নি। এই পৃথিবীতে জন্মে একটা নামও কি তার প্রাপ্য নয়? বাড়িতে পোষা গোরু-ছাগল-কুকুরেরও একটা করে নাম থাকে। ঐ ছেলেটির কোনো নাম নেই।

গাছের আড়াল থেকে সে উঁকি মেরে আমাদের দেখছিল। কী ভাবছিল, কে জানে?

প্রতিশোধের একদিক

অবিনাশ আমাকে ওরকম অপমান করে গেল, আমি ওর ওপর ভয়ংকর প্রতিশোধ নেবো ঠিক করলুম। প্রতিশোধের কথা ভাবতে ভাবতে আমার এমন রাগ এলো শরীরে, যেন সমস্ত শরীরে বিষম জ্বর। কিন্তু আমাকে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। বেশী রাগ করলে আমারই ক্ষতি, তাহলে অবিনাশই জিতে যাবে— অবিনাশই প্রতিশোধ নেবে আমার ওপর।

মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য আমি খবরের কাগজ পড়া শুরু করি। তখন আবার অবিনাশকে ছেড়ে পৃথিবীর আরও অনেকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হয়। এত প্রতিশোধের চিন্তায় অবশ্য আমার সামান্য হাসিও পায়, তারপর চায়ের বদলে এক কাপ কফি খাবার শখ হলো হঠাৎ। গৌরীদের বাড়িতে গিয়ে একসময় কফি খেতাম। গৌরী, তুমি সাবধান, জানো না তোমার কি বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

বাথরুমে দাড়ি কামাতে গিয়ে গালটা খরখর করে। শীতের সময় সাবান লাগাতে না লাগাতে শুকিয়ে যায়। আসলে ব্লেডটা পুরোনো। এই একটাই শৌখিনতা আছে আমার, সস্তা ব্লেডে দাড়ি কামাতে পারি না। কয়েকদিন ধরেই ব্লেড কিনতে ভুলে যাচ্ছি। কিন্তু এখন এই অবস্থায়, মুখে সাবান-মাখা, জুলপির কাছে খানিকটা কামানো, আমি কি করবো? বেরিয়ে গিয়ে এখন তো আর ব্লেড কিনে আনা যায় না, অথচ সেফটি রেজারটা টানতে গেলেই গালে অসম্ভব জ্বালা করছে। প্রায় কান্না এসে যাবার মতো। আমারই ভুলের জন্য এই আমার কষ্ট, কিন্তু নিজের ওপর বেশীক্ষণ রাগ করা যায় না, তাই অবিনাশের প্রতি রাগটা আবার ফিরে এলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অবিনাশের কথা ভেবে আমার মুখে বেশ খানিকটা ক্রোধ ও হিংস্রতা জেগে উঠলো। আমি ভুরু দুটো কুঁকড়ে, বাঁ চোখটা ছোট করে, ঠোঁট কামড়ে ভয়ংকর মুখে খুনী সেজে তাকিয়ে রইলুম। হঠাৎ খেয়াল হলো, ছেলেমানুষের মতো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেংচি কাটছি দেখলে বড় বৌদি হয়তো হেসে উঠবেন। তাড়াতাড়ি দরজায় ছিটকিনি তুলে দিলাম। এইবার আমি আবার আয়নার কাছে, এই আয়নাটাই অবিনাশ, এর সামনে দাঁড়িয়ে আমি এখন প্রকৃত খুনী। নিজের মুখে যদিও এখন অর্ধেকটা সাবান লেগে আছে, কিন্তু আয়নার ওপাশে

আমার মুখ পরিষ্কার এবং কঠিন। নিজের ওরকম চেহারা দেখে আমারই ভয় করতে থাকে, রাগের সময় আমার চোখ ওরকম ভয়ংকর ঠান্ডা ও মর্মভেদী হতে পারে, আগে তো জানতুম না। ডান হাত সেফটি রেজারটা ছুরির মতো তুলে ধরা। এই রকমভাবে অবিনাশের সামনে দাঁড়ালে...

হঠাৎ মনে পড়লো, দার্জিলিঙে গিয়ে আমি একবার একটা ভোজালি কিনেছিলাম। বেশ বড়ো সাইজের, সুন্দর চামড়ার খাপে মোড়া। কিছুদিন সেটাকে ঘর সাজাবার জন্য ঝুলিয়ে রেখেছিলাম দেয়ালে, তারপর ধুলোয় ওর খাপটা ময়লা হয়ে যেতে দেখে বাক্সে ভরে রেখেছি, ওটাকে তো কখনও ব্যবহার করাই হয়নি। কোনো রকমে দাড়ি কামানো শেষ করে বাক্স খুলে ভোজালিটা বার করলুম। এখনো বেশ চকচকেই আছে, রাখার সময় বোধহয় বুদ্ধি করে ভেসলিন মাখিয়ে রেখেছিলাম। ফলাটার চারপাশে হাত দিলেই বোঝা যায় বেশ ধার। এরকম ধারালো জিনিসে হাত দিলেই শরীর কেমন শিরশির করে। ব্লেডে ধার না থাকলে বিরক্ত লাগে, কিন্তু ছুরিতে অতটা ধার থাকা যেন সহ্য হয় না। শুধু চকচকে এবং বাঁকানো ফলা থাকাই যথেষ্ট ছিল। সমস্ত শরীরে অসহ্য অপমানের রাগ, হাতে মারাত্মক ভোজালি—এ কি অন্যরকম চেহারা আমার আজ। এই অস্ত্রটা কিনেছিলাম ছ-সাত বছর আগে, কোনো উদ্দেশ্য ছিল না—খাপ শুদ্ধ ছুরিটা দেখতে বেশ সুন্দর ছিল বলেই কিনেছিলাম। তখন কোনো সুন্দর জিনিস দেখলেই আত্মসাৎ করার ইচ্ছে হতো। গৌরীকে পাবার জন্য তখন যেমন উন্মুখ হয়ে ছিলাম। গৌরীকে ধরার চেষ্টায় আমার হাত দুটো তখন কম ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে?

কিন্তু, এই ভোজালি দিয়ে অবিনাশকে আমি খুন করবো না কি? ঠিক অতখানি...ধরা পড়ার অবশ্য ভয় নেই। জীবনে হাজার হাজার গোয়েন্দা গল্প পড়েছি, ভালো ভালো বইতে দেখেছি,—খুনীর কাজ প্রায় নিখুঁত, শুধু সামান্য একটা ভুলের জন্য শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে। আমি আগাগোড়া ওদের কারুকে অনুসরণ করে, সাবধানে শুধু সেই ভুলটা এড়িয়ে যাবো। তাহলে কে ধরবে? না. ওসব ধরা-টরা পড়ার কথা আমি ভাবি না। কাগজেও তো দেখেছি, বাংলাদেশে বছরে গড়ে সাড়ে চারশো খুন হয়, তার মধ্যে মাত্র শ দেড়েক খুনী ধরা পড়ে। তাহলে আমাকে ধরা, আমি সব সময়েই সংখ্যাগরিষ্ঠদের দলে !...অবিনাশকে খুন করার অবশ্য অন্য একটা বিপদ আছে, যদি ওকে খুন করার পর আমার অনুতাপ আসে? সে এক ঝঞ্ঝাট! অনুতাপে আমি জ্বলে পুড়ে মরছি, প্রতিটি নিশ্বাস দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরুচ্ছে, কয়েক মণ বোঝা বয়ে বেড়াবার মতো বুকের মধ্যে গোপনতার দুঃখ, তাহলে অবিনাশই জিতে যাবে।

অপমানের পর সেটা হবে আবার অবিনাশের নিজস্ব প্রতিশোধ।

তাছাড়া সত্যিকথা বলতে কি অবিনাশের সামনে আমি যখন ছুরি তুলে দাঁড়াবো—তখন যদি হঠাৎ গৌরী এসে পড়ে, নিশ্চয়ই গৌরী আমাকে দেখে ছি-ছি

করে হেসে উঠবে। হাসতে হাসতে দুলে দুলে উঠবে, হাসির দমকে মুখচোখ লাল হয়ে যাবে, বলা যায় না—বোধহয় আমার আর অবিনাশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাসি কুলকুচো করে বলবে, ইস, বীরপুরুষ, আমাকে মারো তো, দেখি কতখানি সাহস হয়েছে আজ কাল! সেই বিশ্রী নাটকীয় পরিস্থিতিতে আমি কি করবো, ঠিক করাই মুশকিল। অবিনাশটা নিশ্চিত সেই সুযোগে মিটি-মিটি হাসবে। পেশাদারী খুনীদের মতো ধাক্কা মেরে আমি মাঝখান থেকে গৌরীকে [illegible] দিতেও পারবো না, কারণ গৌরীর শরীর আর আমি কখনো ছোঁবো না, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। না ছুঁয়েও, ছুরির এক খোঁচায় গৌরীকে সরিয়ে দেওয়া যায়, কিংবা ছুরির ভোঁতা দিকটা দিয়ে ওর মাথায় মারলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে! এমন আর শক্ত কি, এই তো আমি ভোজালিটা ধরে আছি; কব্জিটা ঘুরিয়ে নিলেই উল্টো হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মারলুম গৌরীর মাথায়। আমার হাত তোমাকে আর কখনো ছোঁবে না, গৌরীকে বলেছিলাম, ছুরি দিয়ে ছুঁলে প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয় না।

কিন্তু, গৌরী যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাসবে, সেইটাই সমস্যা। গৌরীর ওপর আমার কোনো রাগ নেই, তবে আমার শখ হয় গৌরীর মনে দুঃখ দিতে। কিন্তু কোন্ অস্ত্র দিয়ে মনের মধ্যে দুঃখ দেওয়া যায়, তাও তো জানি না। শরীরে আঘাত করার ঠিক কোনো কারণ নেই। গৌরী শেষ মুহূর্তেও আমাকে বিশ্বাস করবে না, কারণ ও জানে আমি কাপুরুষ। ওর ধারণা, আমি জীবনে কখনো কোনো দুঃসাহসের কাজ করতে পারবো না। যে আমাকে হৃদয়ের গভীর পর্যন্ত কাপুরুষ বলে জানে, তার সামনে কি আমি কখনো সাহসী হয়ে উঠতে পারবো?

ছেলেবেলায় একবার, তখন দশ-এগারো বছর বয়েস আমার, খুব ঘুড়ি ওড়াবার শখ ছিল, ছোটমামার পকেট থেকে পয়সা চুরি করেছিলাম। না, একবার নয়, তার আগেও দু-তিনবার ছোটমামার পকেট থেকে সিকি তুলে নিয়েছি, তিনি একটু উদাসীন প্রকৃতির লোক বলে হয়তো খেয়াল করতেন না। একদিন সদ্য তাঁর পকেটে হাত ঢুকিয়েছি, তিনি এসে পড়ে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে ফেললেন! আমি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ছোটমামা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। চড়-চাপড় বকুনি কিছুই দিলেন না, শুধু ঠান্ডা চোখ তুলে তাকিয়ে ভারী গলায় বললেন, এরকম কাজ জীবনে আর কখনো করো না। মাঝে মাঝে আমার কাছে দু-এক আনা চেয়ে নিয়ে যেও:—ছোটমামা ঐ ঘটনা আর কারুকে বলেন নি, জীবনে আর কখনো উল্লেখও করেন নি। তারপর কুড়ি বছর কেটে গেছে, সেই পকেট মারার পর থেকে আমি আর পকেট মারা শিখিনি, আমি বড় চোর কিংবা ব্যাঙ্কডাকাত কিংবা কালোবাজারি কিছুই হইনি। এখন অন্যদেরই মতো সাধারণ মানুষ, এমনকি দোতলা বাসে আমি একদিন একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, তার মধ্যে প্রায় তিনশো টাকা ছিল এবং মালিকের নাম লেখা কার্ড ছিল বলে আমি টাকা-শুদ্ধু ব্যাগ ভদ্র-

লোকের বাড়িতে ফেরত দিয়ে প্রভূত কৃতজ্ঞতা এবং পুণ্য সঞ্চয় করেছি। ছোট-মামার ছেলেটা একটু বখাটে ধরনের হয়েছে, সে আমার কাছ থেকে প্রায়ই দু-পাঁচ টাকা নিয়ে যায়, কিন্তু এত সবের পরেও, এখনও আমি যখন ছোটমামার ঠাণ্ডা চোখের সামনে দাঁড়াই আমার ভঙ্গি অবিকল চোরের মতো সঙ্কুচিত, আমি ছোট-মামার চোখের দিকে আজও তাকাতে পারি না।

আমি কখনো কোনো সাহসের কাজ করিনি তা নয়, কিন্তু গৌরীর কাছে কাপুরুষ বলে চিহ্নিত হয়ে আছি। একবার, সেই যখন গৌরীর ছোট বোন শান্তা জলে ডুবে যায়…। বারাসতে পিকনিকে গিয়েছিলাম, উনিশশো চুয়ান্নর শীতে, দলবল মিলে অনেকে। শান্তা বয়সে তখন সাত, শান্তাকে নিয়ে আমি আর গৌরী বাগানের অনেক ভেতরে চলে গেছি, একটা ছোট্ট পাড়-বাঁধানো টলটলে পুকুরের পাড়ে বসেছি,—আজও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার আর গৌরীর বসে থাকা, গৌরী খুব চড়া হলুদ রঙের শাড়ী পরে ছিল, কমলা রঙের ব্লাউজ—গৌরীর রং খুব ফর্সা বলে ও পোশাকের রং নিয়ে লণ্ডভণ্ড খেলা খেলতে ভালোবাসে, আমি বোধ হয় একটা কর্ডের প্যান্ট ও গেঞ্জি পরেছি, গৌরী শাড়ী থেকে চোরকাঁটা তুলছে, আমি এক টুকরো নারকোল চিবিয়ে সাদা ছিবড়েগুলো ফু-র-র করে উড়িয়ে দিচ্ছিলাম। আমাদের সেই বসে থাকার দৃশ্যের মধ্যে শান্তাকে দেখতে পাচ্ছি না। শান্তা ছিল না, শান্তা টোপাকুল কুড়োতে কুড়োতে কখন জলে পড়ে গেছে। হঠাৎ শব্দ পেলাম, পাড় থেকে বেশ খানিকটা দূরে জলের আলোড়ন এবং শান্তার ক্ষীণমুষ্টি। তৎক্ষণাৎ দুজনে দাঁড়িয়ে উঠেছি, গৌরী হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে অন্যরকম গলায় তীক্ষ্ণভাবে ডেকে উঠলো, সুনন্দদা!— মনস্থির করতে আমার দেরি হয় নি। আমি এক ঝটকায় গৌরীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাগানের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করছিলুম, অবিনাশ! তাপস! কেষ্টবাবু! কেষ্টবাবু! শিগগির—। আমার সেই চিৎকার এমন অসম্ভব উন্মত্ত ছিল যে, বোধ হয় তিনশো মাইল দূর থেকেও শোনা গেছে।

এতক্ষণে গৌরী নিজেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং কেষ্টবাবু এসে লাফিয়ে পড়ার মধ্যে শান্তাকে গৌরীই প্রায় নিয়ে এসেছে পাড়ের কাছে। শান্তা মরেনি। অল্প চেষ্টাতেই ভালো হয়ে ওঠে। বিপদ কেটে যাবার পর আমরা যখন সবিস্তারে গল্প করছি, আমি খানিকটা কৃতিত্ব নেবারও চেষ্টা করছিলুম, আমি কি রকম মাথা ঠাণ্ডা রেখে মুহূর্তের মধ্যে দলবলকে ডেকে জড়ো করতে পেরেছি—হঠাৎ গৌরী আমাকে থামিয়ে দিয়ে শ্লেষের সঙ্গে বললো, থাক্, থাক্, বীরপুরুষ! খুব বোঝা গেছে, গলার জোর ছাড়া আর কিছুই নেই!—সকলে একথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠলো। আমার মুখের ওপর সপাং করে চাবুকের আঘাত পড়লো যেন। এতক্ষণে আমি একবারও ভাবিনি, আমি কোনো কাপুরুষতার কাজ করেছি। আমি যে সাঁতার জানি না—তা তো

সবাই জানে। শান্তার জন্যে আমি নিজে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লে কী লাভ হতো? আরও কিছু বিপদ বাড়তো। সাঁতার না জানা দোষের হতে পারে, কিন্তু সাঁতার না-জেনেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়া কি খুব গৌরবের? সাঁতার জানি না বলেই আমি পুকুরে না নেমে ছুটে গেছি অন্যের সাহায্যের জন্য। আমার কাছে সেইটাই মনে হয়েছিল সবচেয়ে স্বাভাবিক। কিন্তু সকলেরই চোখে সেটা হাস্যকর ও কাপুরুষতা বলে মনে হয়েছে।

তারপর আমি গোপনে সাঁতার শিখে নিয়েছি। এখন আমি অনায়াসে যে-কোনো পুকুর এপার-ওপার হতে পারি, কিন্তু এ পর্যন্ত আর কারুকে জল থেকে উদ্ধার করার সুযোগ পাই নি। এমন কি গৌরীর সঙ্গেও আর কোনো নির্জন জলাশয়ের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সুযোগ গৌরী আমাকে আর দেবে না, যাতে আমি নিজেই ওকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে পরে আবার উদ্ধার করে বীরত্ব দেখাতে পারি।

শান্তা বেঁচে উঠেছিল বলেই, সে-ঘটনা গৌরী বেশিদিন মনে রাখেনি। কিন্তু পরের আর-একটি ঘটনায় গৌরীর বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যায়। রাজা বসন্ত রায় রোডের এক গানের জলসা শুনে ফেরার পথে, তখন রাত দশটা, দোতলা বাস থেকে আমি আর গৌরী নেমে পড়েছিলাম এসপ্লানেডে। ইচ্ছে ছিল, গৌরীর সঙ্গে ময়দানের অন্ধকারে কিছুক্ষণ বসি। তখন আমি খুব বেশী অস্থির ধরনের ছিলাম। তখন আমার অদ্ভুত ধরনের বিশ্বাস ছিল, (কোনো মেয়েকে কোনো আন্তরিক কথা বলতে গেলে সেই সময় তাকে জড়িয়ে ধরতে হয়। বুক স্পর্শ না করে বুকের মধ্যে ঢোকা যায় না।) এতদিন ধরে গৌরীর সঙ্গে আমার চেনা, অথচ, গৌরীকে কিছুই মনের কথা বলা হয় নি। কী আমার মনের কথা, জানি না। কিন্তু কিছু একটা যেন আমার বলার আছে। সেদিন আমার ইচ্ছে ছিল, দু'হাত দিয়ে গৌরীর সারা শরীর জড়িয়ে ধরবো, যাতে এমন কোনো কথা আমার মুখে আসে, যা খুব আন্তরিক শোনাবে। এতদিন গৌরীকে তেমনভাবে জড়িয়ে ধরিনি বলেই কোনো কথা মনে আসে নি। গৌরীর মুখও সেদিন খানিকটা উত্তেজিত দেখাচ্ছিল, ওর বাবা তখনও গানের জলসা শুনছেন, আমি ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসে—মাঠের মধ্যে নেমে পড়েছি, এমন সহজে রাজী হবার মেয়েও নয় গৌরী। সেদিন ওর মুখচ্ছবি অন্য রকম।

কিন্তু, সেই বাইশ-তেইশ বছর বয়েসে, আমার মনে হতো একটি মেয়েকে নিরালায় আলিঙ্গন করার মতো জায়গা, সারা পৃথিবীতে কোথাও নেই। সব সময়েই এক হাজার চোখ চেয়ে আছে। কার্জন পার্ক ছাড়িয়ে এসে দু'জনে শহীদ স্তম্ভের ওখানটায় এসে পৌঁছলুম। সেখানেও চার-পাঁচজন লোক। আরও কিছুদূর এসে, বললুম, চলো গঙ্গার পাড়ে যাই।

—না, অতদূর না। ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে যে।

ফিরে, রেড রোড ধরে হাঁটতে লাগলুম। কিছুটা এগিয়েই যেন গা ছমছম

করে, অল্প শীতের আকাশের নীচে ফাঁকা, কালো রাস্তা। কোথাও কোনো মানুষ-জন নেই। এখানে প্রায়ই গুণ্ডা-বদমাসের উপদ্রব হয় শুনেছিলাম। আবার খানিকটা ফিরে এসে, র‍্যামপ্যার্টের মাঠের অন্ধকারে আমি গৌরীর হাত টেনে ঘাসের ওপর বসিয়ে দিলাম। বড় রাস্তা খুব বেশী দূরে নয়, আমরা সেখানকার গাড়ি চলাচল দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আমি গৌরীর হাতটা তুলে নিয়েছি আমার দু' হাতের মুঠোয়। আহা, সেই তেইশ বছর বয়েস, যখন হাত ছুঁলেও বুক কেঁপে উঠতো। গৌরী চুপ, যেন আমার কাছ থেকে কিছু প্রতীক্ষা করছে। প্রচণ্ড অন্ধকারের মধ্যে শিরশিরে হাওয়া, আমি ওর হাতটা ধরে আলতো টান দিয়ে ডাকলুম, গৌরী।

গৌরী খুব চটপটে এবং সরু জিভের মেয়ে, জেদী ধরনের। অধিকাংশ সময়েই ওর খেয়াল অনুযায়ী আমাকে চলতে হয়, কিন্তু সেদিন ও কিছুই বলছিল না। আমার ডাকের উত্তরে শুধু বললো, উঁ? আমি গৌরীর সম্পূর্ণ দেহটা দু' হাতে ধরে আমার বুকের ওপরে নিয়ে আসি, ও কিছুই বাধা দিলো না, বরং ওর শরীর থেকে গরম হল্‌কা যেন আমার চোখেমুখে লাগছিল। আমি গৌরীকে বুকে জড়িয়ে আছি, কিন্তু সেই যে কী যেন একটা আন্তরিক কথা ওকে বলবো, তার কিছুই মনে এলো না। কী কথা আমার বলা উচিত ছিল। গৌরীকে বুকের ওপরে পেয়েছি, আরও নিবিড়ভাবে, প্রবলভাবে ওকে জড়িয়ে ধরার কথাই শুধু মাথায় আসছিল। একটাও কথা বলছি না, একটা কিছু বলা উচিত, কিন্তু গৌরী তোমাকে আরও জড়িয়ে ধরতে চাই, এ কথা মুখে বলা যায় না। তা ছাড়া তখনও আমি বুঝতেই পারি নি, গৌরী কতখানি আমাকে শুধু প্রশ্রয় দিচ্ছে, কতখানি নিজে থেকে চাইছে। আমার যে-কোনো কাজেই গৌরী কখনও না কখনও কিছুটা বাধা দিয়েছে, কিন্তু আগে কখনও ওকে ওভাবে আলিঙ্গন করি নি, অথচ সেদিন ক্ষীণতম বাধাও দেয় নি, তাতেই আমি বিচলিত হয়ে পড়ছিলুম। মনে হচ্ছিল, এর মধ্যে কিছু একটা যেন ধাঁধা আছে।

গৌরীই প্রথম পায়ের শব্দ শুনতে পায়। একটা সাদা পোশাকপরা লোক মাঠের ভেতর দিক থেকে দৌড়ে আসছে। আমরা দুজন ছিটকে আবার পাশাপাশি বসলাম। লোকটা বললো, সাবধান, পালাবার চেষ্টা করলেই হুইস্‌ল বাজাবো।

আমরা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েছি। গৌরী আমার হাত ধরেছে। লোকটা এসে বললো, চলুন থানায়। খুব ফুর্তি হচ্ছে! অ্যাঁ?

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কে আপনি?

লোকটা বক্রভাবে হাসলো, হেসে পকেট থেকে কার্ড বার করলো। আমি গুণ্ডার ভয় করছিলুম, কিন্তু এ যে দেখছি লালবাজারের পুলিস ইন্সপেক্টর। লোকটার মুখে তখনও হুইস্‌ল, হাতের ছোট টর্চ জেবলে আমায় কার্ডটা পড়ালো তারপর বললো, অনেকক্ষণ থেকে আপনাদের ফলো করছি। ঐ মোড়ের কাছে

'ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে, চলুন।

আমি শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলুম, কেন, কী অন্যায় করেছি?

—থানায় গিয়েই জিজ্ঞেস করবেন। লক্ষ্য করেছি তখন থেকে শহীদ স্তম্ভ, রেড রোড ঘুরে এখানে এসেছেন। এ জায়গাটাই বুঝি পছন্দ হলো? যত্তো সব—এক রাত্তির তো হাজতে থাকুন, তারপর কাল সকালে দুজনের বাবা-মাকে খবর পাঠাবো—

আমি শুনে শিউরে উঠেছিলাম। দৃশ্যটা কল্পনা করতেই মাথা ঘুরে যাচ্ছিল। থানার হাজতে দু'জনে আটকে থাকবো, সারা রাত গৌরীর বাবা পাগলের মতো কোথায় খুঁজবেন কে-জানে, পরদিন থানার লোকেরা যতদূর সম্ভব কুৎসিত কথা বলবে নিশ্চিত, হয়তো এ খবর কাগজে ছাপা হবে—গৌরীর মতো অভিমানী মেয়ের কি যে অবস্থা হবে তখন…। আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখলুম, গৌরী মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি পুলিসের লোকটির হাত জড়িয়ে ধরে বললুম, দয়া করে আমাদের ছেড়ে দিন! দয়া করে…। আমরা জানতুম না, এখানে বসা বে-আইনী।

—হুঁ শুধু বসা? বসে বসে ধর্ম আলোচনা, না? কলকাতা আজকাল ভরে যাচ্ছে এই সবে! চলো থানায়, তারপর—

লোকটা খপ করে গৌরীর একটা হাত চেপে ধরলো। লোমশ ধরনের বিশ্রী হাতে গৌরীকে ধরেছে, আমার রক্ত ছলাৎ করে উঠলো, কিন্তু আমার ধারণা ছিল, পুলিসকে মেরে কেউ কোনোদিন নিস্তার পায় না। তা ছাড়া লোকটার মুখে তখনও হুইস্‌ল, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছিল। গৌরীর কথা ভেবে লজ্জায় অপমানে আমার মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল. থানায় নিয়ে গেলে তার ফল যে কী হবে, ভাবতেও পারি না। আমি পকেট থেকে তাড়াতাড়ি আমার যথাসম্বল চারটে টাকা বার করে বললুম, এই নিয়ে দয়া করে আমাদের ছেড়ে দিন, আপনার কাছে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ থাকবো। নইলে আমাদের এমন বিপদ হবে, দয়া করুন—

পুলিসের লোকটি সেই রকম চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, মোটে চাড্ডাকা? ঘড়ি-ফড়িও তো হাতে নেই দেখছি! ফুর্তি করা আজকাল খুব সস্তা হয়েছে, না? গুঁতো না খেলে লাল গড়ানো বন্ধ হবে না—

গৌরী তখন এক ঝট্‌কায় হাত ছাড়িয়ে বললো, হাত ছেড়ে কথা বলুন।

—ইস্! এখনও ফোঁস করা—

আমি চরম মিনতির ভঙ্গিতেই বললুম, আপনাকে দয়া করতেই হবে। আর কোনোদিন আমরা—

লোকটা দু'হাতে গৌরীকে জড়িয়ে ধরলো। গৌরী পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলো ছেড়ে দিন, খবরদার, ছেড়ে দিন—! ঝটাপটির মধ্যে লোকটা—'উঃ' করে চেঁচিয়ে উঠলো। গৌরী ওর হাতে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে, দিয়ে

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। আমি তখন দুর্নামের দারুণ ভয়ে, যে রকম ভয়, বাইশ-তেইশ বছরেই পাওয়া সম্ভব, তখনও লোকটাকে তোষামোদ করার চেষ্টা করছি। দেখুন, আমাদের জীবনটা নষ্ট করে দেবেন না। লোকটা বললো, চুপ! কিন্তু সেই সময় অন্য শব্দ শোনা গেল। কোথা থেকে হুস্ করে একটা পুলিসের ভ্যান এসে দূরে রাস্তায় দাঁড়ালো, তিনজন পোশাক পরা পুলিস দৌড়ে আসতে লাগলো এদিকে। আমি কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বিমূঢ় হয়েছিলুম। তা হলে সত্যি আর উপায় নেই? থানায় যেতেই হলো। গৌরী অমন ফুঁসে না উঠলে হয়তো ছাড়া পাওয়া যেতেও পারতো। হঠাৎ দেখি সেই লোকটা অন্ধকারের মধ্যে ছুটে পালাচ্ছে। সেই মুহূর্তে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম। গৌরীকে ফেলে রেখেই আমি ছুটলাম লোকটার পিছনে, লোকটার জামাও ধরে ফেলেছিলাম, কিন্তু সে আমাকে আচমকা একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। লোকটার জামার খানিকটা অংশ ছিঁড়ে রয়ে গেল আমার হাতের মুঠোয়, আমি উঠে দাঁড়াবার মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমি ফিরে এলাম গৌরীর কাছে, একজন মধ্যবয়স্ক পুলিস ইন্সপেক্টর ও দু'জন সেপাই দাঁড়িয়ে। পুরো ঘটনাটা শুনে ইন্সপেক্টার একজন সেপাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, এ তো দেখছি রামেশ্বরের কাণ্ড। আবার শুরু করেছে। কবে ছাড়া পেলো?

—লাস্ট মান্থ-এ স্যার।

—ওটাকে আবার পুরে দিতে হবে। আপনারা বাড়ি যান—এ দিকটায় রাত্রে বেশিক্ষণ থাকবেন না, এমনিতেই নানা উৎপাত হয়।

—আমরা জানতুম না! আপনারা যে ঠিক সময় এসে পড়েছেন, সত্যিই··· লোকটাকে একটুও সন্দেহ করিনি।

—যাক গে—। ডানদিক দিয়ে সোজা বড় রাস্তা দিয়ে চলে যান—ওখান থেকে বাস ধরুন। আর কোনো ভয় নেই—। আচ্ছা, আপনাদের নাম-ঠিকানা দিয়ে যান। রামেশ্বর ধরা পড়বেই—ওর কেস উঠলে আপনাদের সাক্ষীর জন্য ডাকবো।

আমি তখন অম্লান মুখে ভুল নাম-ঠিকানা লিখে দিলাম। গৌরী কিন্তু নিজের নামই বললো।

অন্ধকার মাঠের মধ্যে একটু খুঁজতেই গৌরীর হাত-ব্যাগটা পাওয়া গেল। আমার চারটে টাকাও লোকটা নিয়ে যেতে পারে নি। কয়েক মিনিট আগে কী বিরাট বিপদের মুখে পড়েছিলাম, হঠাৎ কী রকম সহজে মিটে গেল। দু'জনে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলুম। আমার বুকের মধ্যে তখনও ধক্‌ধক্ করছে। প্রায় মিউজিয়ামের কাছ পর্যন্ত পোঁছে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে আমি হাসি মুখে আলতোভাবে গৌরীর কাঁধে আমার হাত রাখলাম। গৌরী সামান্য শরীর মুচড়ে আমার হাত সরিয়ে দিলো। আমি ভেবেছিলাম, গৌরী তখনও উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে আছে। আমি তখন ওর একটা হাত ধরতে যাই। গৌরী মৃদু

অথচ দৃঢ় হেঁচকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, না।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কী গৌরী?

—নীলুদা, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।

আমি পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লুম. তখনও কিন্তু বুঝতে পারি নি। বললুম, সত্যি কী বিশ্রী কাণ্ড! লোকটা এমনভাবে –

—নীলুদা, তুমি আর কোনোদিন আমাকে ছুঁয়ো না।

—কেন?

—তোমার সামনে অন্য একজন লোক আমার গায়ে হাত দিয়েছে, তবু তুমি সহ্য করেছো। তুমি আমাকে ছুঁযো না আব—

যেন আমি শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে পথ হাঁটছিলুম, এমন সময় পিছন থেকে একটা বিষাক্ত তীর আমার পিঠে বিঁধে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি মরে গিয়েছিলুম। আমি রক্তহীন বিহ্বল গলায় প্রেতের মতো বললুম, এই তোমার ধারণা হলো? লোকটা যে পুলিস নয়, আমি মুহূর্তেও বুঝতে পারি নি। আমি কি পুলিসের সঙ্গে মারামারি করবো, তুমি চেয়েছিলে?

—ও কথা থাক! আর না, চলো বাড়ি যাই।

প্রচণ্ড অভিমানে আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলুম। গৌরী শেষ পর্যন্ত এই রকম অর্থ করলো? লোকটা এমন কিছু শক্তিশালী ছিল না · ওর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আমি একটুও ভয় পেতুম না। আমি তো আগাগোড়া শুধু গৌরীর কথাই ভাবছিলুম। থানা, গৌরীর বাবা, খবরের কাগজ, পাড়ার ছেলেদের হাসাহাসি, কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারী হিসেবে গৌরীর সম্মান। আমি ভেবেছিলাম বড় কেলেংকারীর বদলে ছোট অপমান সহ্য করা অনেক ভালো। অন্ধকারে, আর কেউ নেই—আমি লোকটার কাছে ওরকম দীন হয়েছিলাম, যাতে দিনের আলোয় হাজার লোকচক্ষুর সামনের অপমান থেকে বাঁচা যায়। অনুনয় করে বা ঘুষ দিয়ে পুলিসের হাত থেকে বাঁচা যায়. কিন্তু মারামারি করলে… আমার সেই মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হলো ঈশ্বর নামে একজনের থাকা দরকার. যে-কিনা অন্তর্যামী, সে এসে এখন বলুক, সাক্ষী দিক যে আমি শুধু গৌরীর সম্মানের কথাই ভাবছিলাম। লোকটা যখন গৌরীর গায়ে হাত দেয়, তখন আমার রাগে শরীর জ্বলেছিল, কিন্তু ভেবেছিলুম সে আমার স্বার্থপরতা, গৌরীকে বাঁচাবার জন্যে আমাকে আরও ছোট হতে হবে, শুধু গৌরীর জন্যই আমাকে একা থানায় নিয়ে গেলে কিছুই আসতো যেতো না, কিন্তু…

সারা রাস্তা গৌরী আর আমার সঙ্গে একটাও কথা বলে নি। গৌরীর মুখ কঠিন, চোখের দৃষ্টি দূরের দিকে স্থির। আমি পাংশু বিবর্ণ মুখে বসেছিলাম, তখন আমার বুক রাগে জ্বলছিল, গৌরীকে আর কিছু বুঝিয়ে বলার ইচ্ছেও ছিল না। সেই রাগ ক্রমশ বাষ্প হয়ে, পাতলা অভিমানের রঙ নিয়ে আমার বুকের কাছেই আটকে রইলো বহুদিন। সেই শেষ, গৌরীর কাছে আমি কাপুরুষ

রয়ে গেলাম। গৌরীর সঙ্গে আর কোনোদিন আমার দেখা করতে ইচ্ছা হয় নি। মাঝে মাঝে এখানে সেখানে নানা লোকের মধ্যে দেখা হয়েছে হয়তো, কিন্তু আমি ওর চোখের দিকে তাকাইনি আর। আজ যদি আমি বিশ্ববিজয়ী হয়েও ওর সামনে দাঁড়াই, গৌরী ভাববে আমি কোনো নাটকে অভিনয় করছি। গৌরীর সামনে যদি আমি পৃথিবীর বৃহত্তম শত্রুকেও আঘাত করি—গৌরী ভাববে ও আমার নিজস্ব আঘাত নয়, কোনো দম দেওয়া স্প্রিংয়ের পুতুলের কাণ্ড।

যাক্। গৌরীর ওপর আমার আর কোনো রাগ নেই গৌরীর সামনে নিজের বীরত্ব প্রমাণ করার কোনো ইচ্ছেও নেই। গৌরীর সামনে কে বীরপুরুষ কে কাপুরুষ হয়ে রইলো—তাতে আমার আর কিছু আসে যায় না। যে খেলা থেকে আমি আমার নাম তুলে নিয়েছি—সে খেলায় এখন কে জেতে কে হারে—তাতে আমার কোনো উৎসাহ নেই। অবিনাশের সঙ্গে গৌরীর যা ইচ্ছে সম্পর্ক থাক—কিন্তু অবিনাশ আমার বাড়িতে সকালে এসে কেন আমায় অপমান করে গেল। কেন আমার বাড়ির সামনে অত বড়ো একটা মটরগাড়ি থামিয়ে সমস্ত পাড়া জানিয়ে ঢুকলো আমার ঘরে? অবিনাশ এসেছিল বলেই, হঠাৎ এখন গৌরীর কথা মনে পড়লো আবার। সেই সকাল থেকেই মুখের মধ্যে নিমপাতা। পৃথিবীতে অনেক অপমান সহ্য করা হলো, এবার একজন কারুর ওপরে প্রতিশোধ নিতেই হবে। অবিনাশ, অবিনাশই বারবার ভেসে উঠছে চোখের সামনে। আজ আর অফিসে যাবো না।

স্নান করে চটপট খাওয়া সেরে নিলুম। তেমন শীত নেই, তবু কোটটা গায়ে চাপিয়ে ভোজালিটা খাপশুদ্ধু রাখলাম কোটের ভেতরের পকেটে। একটু উঁচু হয়ে রইলো, থাক্ কেউ বুঝবে না। ছুরি-ছোরা মেরে প্রতিশোধ নেওয়া ব্যাপারটা বড়ই স্থূল, নিজেই বুকতে পারছি, কিন্তু আমার যে শুরু করতে দেরি হয়ে গেছে। প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে জাগতে আজ সকাল পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হলো কেন?

ভোজালিটা ব্যবহার করি আর না করি, সঙ্গে রাখা ভালো। একটা অস্ত্র শরীরে লুকোনো থাকলে, সামান্য একটা চড়ও জোরালো হয়। তার প্রমাণও পেলুম সঙ্গে সঙ্গে। মোড়ের দোকানে গিয়ে দুটো সিগারেট চাইতেই, অন্য লোক দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকেই আগে দিয়ে দিলো। অন্যদিন দেখেছি, আমি এক প্যাকেট সিগারেট চাইলেও লোকটা অনেকক্ষণ ধরে অন্য লোকের জন্য পান সাজে। গ্রাহ্যই করতে চায় না। আজ হয়তো আমার গলার আওয়াজটাই বদলে গেছে। বাসে উঠেও আমি মনস্থির করে রেখেছিলাম। প্রায়ই দেখেছি, আমি বাস থেকে নেমে আসার সময় কণ্ডাক্টার আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, টিকিট হয়েছে? আমি ঘাড় নাড়া সত্ত্বেও বলে, দেখি? রাগে আমার সমস্ত শরীর জ্বলে যায়। কত লোক ওঠে কত লোক নেমে যায়, শুধু আমারই বেলা গাঢ় অবিশ্বাস নিয়ে কণ্ডাক্টাররা জিজ্ঞেস করে, দেখি তো, দেখান। আজ আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম। প্রথমেই

উঠে টিকিট কেটে, সারা রাস্তা প্রতীক্ষায় ঘাড় শক্ত করে ছিলাম। মাঝে মাঝে কোটের বুকের কাছে ঠেলে ওঠা ভোজালির বাঁটে হাত বুলিয়েছি। কেউ এলো না। নেমে আসার সময় বরং বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলো, স্যার, ক'টা বাজে? আমি গম্ভীরভাবে বললুম, জানি না। ঘড়ি নেই। ওরা বোধ হয় ভাবে, কোটপরা লোক মাত্রেরই হাতঘড়ি থাকে।

এসপ্ল্যানেড অঞ্চলের দুপুরে ফটফট করছে রোদ। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পরই আমি টের পেলুম, আমি অনেক বদলে গেছি। কত লক্ষবার এসেছি এখানে, তেতো মুখে, শুকনো মুখে, ভয়ে, ফুর্তির ঝোঁকে,—আজ আমি এখনো দাঁড়িয়ে আছি অতর্কিত আক্রমণকারীর ভঙ্গিতে। গাড়ি বারান্দার নিচে, থামের আড়ালে আমি দাঁড়িয়ে আছি, কেউ হয়ত আমাকে লক্ষ্যই করছে না, কিন্তু আমি একটা উঁচু মঞ্চে দাঁড়িয়ে, কৃপার চোখে দেখছি সকলকে। শরীরটা খুব হাল্কা লাগছে। প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বাধীন। আদর করে কোটের ওপরে হাত বুলোচ্ছি ভোজালি ছুঁয়ে। কেউ জানে না, এখনও একবারও ব্যবহার করিনি, অথচ এমন সুখ। আশ্চর্য, এমন ভালো জিনিসটা আমি এতদিন বাক্সে ফেলে রেখেছিলাম! শুধু শুধু ভিড়ের মধ্যে সরু হয়ে ঘুরেছি। এখন বুঝতে পারছি, পৃথিবীর বিরুদ্ধে একটা অস্ত্র তুলে ধরা দরকার তাহলে পৃথিবীটা শাসনে থাকে। প্রতিশোধ কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট, তাহলেই বুকের মধ্যে এমন অসম্ভব জোর এসে যায়। আমার মনে হলো, এই মুহূর্তে আমি পথের মধ্যে নেমে দিনের রোদ্দুরে ভোজালিটা ঝলসে মাথার ওপর তুলে পৃথিবীকে বলতে পারি, সাবধান!

কিন্তু অবিনাশের সঙ্গে দেখা হবে সাতটার সময়। তার এখনও ঢের দেরি। এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, এতক্ষণ খুনী সেজে থাকাও সম্ভব নয়, হয়তো এর মধ্যেই আমার মন নরম হয়ে যাবে। দু-একটি সুন্দরী মেয়ে এমন চোখে আটকে যাচ্ছে যে, বহু দূর পর্যন্ত তাদের চলে যাওয়া দেখতে ইচ্ছে করে—সেই সময়টা অবিনাশের কথা মনেও থাকে না। অথবা কোনো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলেও মুশকিল, হয়তো টানতে টানতে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে। অফিসে একটা টেলিফোন করাও দরকার, টেবিলের ওপর একটা জরুরী ফাইল আছে। আমার উচিত ছিল ঐ ফাইলটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নর্দমায় ফেলে আসা অথবা আগুনে পোড়ানো। ও-সব জরুরী ফাইল ছিঁড়ে বা পুড়িয়ে ফেললে কিছুই হয় না, কিন্তু টেবিলের ওপর ফেলে রাখা অপরাধ। খুচরো পয়সা হাতে নিয়ে একটা টেলিফোন করতে ঢুকলুম চায়ের দোকানে।

গজেনবাবুও আজ অফিসে আসেন নি। তাহলে তো চুকেই গেল। সোমবার দেখা যাবে—সে দিন যদি গজেনবাবু জিজ্ঞেস করে, আজ কেন অফিসে যাইনি, স্রেফ বলে দেবো, রেস খেলতে গিয়েছিলাম। দেখি, তারপর কি বলে। আজ

শনিবার ঐ গজকচ্ছপটা নিজে নিশ্চয়ই অফিস না এসে রেসের মাঠে গেছে, আমি জানি।

রিসিভারটা রেখে দিয়েই পরমুহূর্তে আবার তুলে নিলাম। তৎক্ষণাৎ মনে হলো, গৌরীর সঙ্গে একবার কথা না বলে আমার উপায় নেই। অন্তত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে গৌরীকে টেলিফোন করিনি, বছর দুয়েকের মধ্যে তো একবারও দেখা হয়নি, কিন্তু ওর টেলিফোন নাম্বার দেখলুম আমার স্পষ্ট মনে আছে। কোথায় থাকে এ সব স্মৃতি? এতদিনে একবারও মনে করিনি, কত জরুরী নম্বর ভুলে গেছি কিন্তু গৌরীর টেলিফোনের নম্বর ভুলিনি! ঝুঁকে ডায়াল করতে গিয়ে কোটের ফাঁক দিয়ে ভোজালির বাঁটটা প্রায় বেরিয়ে এসেছিল, তাড়াতাড়ি সেটাকে আবার ঢুকিয়ে দিলাম। কাউন্টারের লোকটা দেখতে পায় নি বোধ হয়। একটু-ক্ষণ বেজে ওঠার পরই ওপাশ থেকে অন্যরকম গলা। কে? না উনি তো এখন বাড়িতে নেই, কলেজে আছেন। আপনার নাম কী বলুন?

শান্তার গলা। শান্তা অনেক বড় হয়ে গেছে দেখছি। আমি তো জানতুমই গৌরী এখন কলেজে পড়ায়। শান্তাকে কিছু না বলে রেখে দিলাম। হয়তো কলেজে খোঁজ করলেও পাবো না। এক একদিন এই রকম হয়, টেলিফোনে একবার একজনকে না পেলে তার পর পর প্রত্যেকটি ডাকেই আর কারুকে পাওয়া যায় না। চায়ের দোকানের টেলিফোনে এতগুলো কল করাও বোধ হয় নিয়ম নয়। লোকটি অসহিষ্ণুভাবে তাকাচ্ছিল, আমি পকেট থেকে একটা টাকা বার করে গম্ভীরভাবে বললুম, এর থেকে তিনটে কলের চার্জ কেটে নিন। তারপর আবার ডায়াল ঘোরাতে শুরু করেছি।

এবার একটু নার্ভাস লাগছে। বাড়িতে গৌরীকে পেয়ে গেলেই ভালো হতো। এখন হয়তো ক্লাস নিচ্ছে বা টেলিফোন থেকে অনেক দূরে আছে। কোনো কেরানী বা বেয়ারার মুখে আমার নাম শুনে যদি ভুরু কুঁচকে বলে, কে? আচ্ছা বলে দাও, এখন ব্যস্ত আছে! কিংবা কেরানীরাই যদি খবর পাঠাতে না চায়? কিন্তু সে রকম হতেই পারে না, আমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছি, আজ আমার পকেটে ভোজালি আছে, আমাকে আজ সকলেই মানতে বাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে গৌরীকে পাওয়া গেল, আমার নাম শুনে সত্যিকারের খুশীতে আশ্চর্য হয়ে বললো, এতদিন পরে মনে পড়লো আমাকে? তুমি এখন কোথায়?

—গৌরী, তুমি যদি খুব ব্যস্ত না থাকো, একবার আমার সঙ্গে এসে দেখা করবে?

—কোথায়? কতদূরে? আমি আসতে পারি।

– আমি চৌরঙ্গীর এই চায়ের দোকানে আছি। ঢুকেই বাঁ দিকের ক্যাবিনে বসে থাকবো। তুমি পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে—

—আসছি। সত্যি, ভারী আশ্চর্য লাগছে। আচ্ছা—

আসলে অবিনাশের ওপর যদি আমি প্রতিশোধ নিতে চাই, তখন মাঝপথে

গৌরীর এসে পড়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু গৌরী থাকলে অবিনাশের অপমান সম্পূর্ণ হবে না, আমি বুঝতে পেরেছিলুম। যতই সময় যাচ্ছে, ততই আমার উত্তেজনা আসছে। এখন আর মনের মধ্যে কোথাও কোনো গ্লানি নেই, কুয়াশা নেই, সব স্পষ্ট। এতদিনে আমি অস্ত্র হাতে নিয়েছি। কিন্তু এতদিন পর, হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে!

গৌরীর মুখের সেই ধার ধার ভাবটা আর নেই। অনেকটা কোমল এখন। চোখের পাশে খানিকটা ক্লান্তি ওকে আরও সুন্দরী করছে। চেহারাও একটু ভারী। রেস্টুরেন্টটায় ঢুকে মুহূর্ত দ্বিধা করে, তারপর আবার এগিয়ে এসে পরদা তুলে আমার ক্যাবিনে ঢুকলো। ঢুকে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললো, বাবাঃ, কী লোক! এতদিনে -

—তুমি কেমন আছো, গৌরী?

—ভালো নেই। তুমি কেমন আছো?

—তুমি ভালো নেই কেন?

—মরতে বসেছিলাম তো, খবর নিয়েছিলে? প্লুরিসিতে ভুগলাম এক বছর। এখন আবার বুকে ব্যথা।

—যাঃ আমি শুনেছিলাম তোমার সামান্য হয়েছিল।

—প্রথমে আমি ভেবেছিলাম টি বি। ভেবেছিলাম, মরেই যাবো।

—টি বি তেও আজকাল কেউ মরে না।

পিঠে অসহ্য ব্যথা, বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ফুলে ফুলে যখন কান্না আসতো, তার চেয়ে মরে যাওয়া কম কী? আর দুধ, ডিম, আপেল মসলা ছাড়া মাংস—যতসব অখাদ্য খাবার? খুব খিদে পেয়েছে, আজ অনেক কিছু খাবো এখানে—পয়সা আছে তো তোমার কাছে?

—প্রচুর টাকা আছে! অবিনাশ আজ সকালে বাড়িতে এসেছিল, ও নাকি কবে আমার কাছ থেকে সত্তর টাকা ধার নিয়েছিল, আজ শোধ করে গেল!

—ওর এসবও মনে থাকে বুঝি? আজকাল অনেক টাকা রোজগার করছে শুনেছি।

—শুনেছি মানে? তুমি জানো না বুঝি? তোমার সঙ্গে দেখা হয় না?

—হ্যাঁ হয়। আচ্ছা, ওর কথা থাক্‌। তোমার কথা বলো, কতদিন পর দেখা, কী পাগল তুমি! এতো অভিমান—

গৌরী তোমাকে টেলিফোন করতে আমার ভয় করছিল। যদি আমার নাম শুনেই তুমি ফোন রেখে দাও! যদি গম্ভীরভাবে বলতে, কী চাই?

—আমি এতই খারাপ বুঝি?

—না, তা নয়, তবু কতদিন দেখা হয় নি, আমাদের আর কোনো সম্পর্ক নেই।

—সম্পর্ক কথাটা কি খারাপ শুনতে!

—না সত্যি, এই ক'বছরে তোমার কথা একবারও মনে পড়েনি, হঠাৎ টেলিফোনে।

—কি বিশ্রী স্বভাব হয়েছে তোমার? কোনো মেয়ের সামনে বুঝি বলতে হয়, আমি তোমাকে ভুলে গেছি! একটু খুশী করে বলতেও পারো না?

—কিন্তু আমি তো সত্যিই তোমাকে মনে রাখিনি। তোমার কাছে হেরে গিয়ে আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে কতদূরে চলে এসেছি, এখন চারদিকে তাকিয়ে গা ছম্‌ছম্‌ করে। যেন আমি আনমনে হঠাৎ কোনো উপত্যকার মধ্যে এসে পড়েছি, সামনেও পাহাড়, পিছনেও পাহাড়। সামনেও দেখতে পাই না, পেছনেও কিছু দেখতে পাই না।

—থাক্‌ ওসব বাজে কথা। কিন্তু আজ হঠাৎ তবে টেলিফোন করার সাহস পেলে কোথা থেকে?

—আজ সকালে আমি বদলে গেছি। আজ আমি প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।

—প্রতিশোধ? আমার ওপরে না কি?

গৌরী কৃত্রিম হেসে উঠলো। আমি খুব লক্ষ্য করে ওর হাসির শব্দ শুনলুম। না, ওর হাসিতে আগেকার মতো শ্লেষ নেই। বরং বেশ মধুর। অসুখের পর গৌরী খানিকটা বদলে গেছে। অসুখ হয়েছিল বলেই তাহলে গৌরীর সঙ্গে এতদিন অবিনাশের বিয়ে হয়নি? কিন্তু গৌরীকে দেখে আমার একবারও বুক টনটন করে নি। একটুও পুরোনো দুঃখ জাগে নি। গৌরীর জন্য আমার বুকের মধ্যে সত্যি তা'হলে কোনো দুঃখ ছিল না! কিছু একটা থাকা যেন উচিত ছিল। লোভ কিংবা রাগ! এতদিন আমি ভুল জানতাম। আমি বললুম, না, তোমার ওপরে ঠিক কি জন্য প্রতিশোধ নিতে হবে আমি এখনও জানি না। তবে আমি পৃথিবীর অনেকেরই ওপর প্রতিশোধ নেবো। অবিনাশকে দিয়ে শুরু করতে চাই।

—অবিনাশ? কেন?

অবিনাশ আজ আমার কাছে এসে বিষম অপমান করে গেছে।

—অবিনাশের কি ক্ষমতা আছে তোমাকে অপমান করার? আমি ছাড়া আর তো কেউ পারে নি!

—গৌরী, তুমি আঁতে ঘা দিয়ে বলছো।

—না থাক্‌, অবিনাশ কি করেছে?

—অবিনাশ এসেছিল আমার উপকার করতে। প্রায় বছরখানেক বাদে ওকে দেখলুম, দেখেই বুঝতে পারলুম অবিনাশের চেহারার মধ্যে একটা চোরের ছাপ ফুটেছে। অবিনাশ বড়লোকও হয়েছে চোরও হয়েছে। দেখলেই চেনা যায়। যেদিন থেকে ও ওর কাকার ইনজিনিয়ারিং ফার্মে পার্টনার হয়ে ঢুকেছে, সেদিন থেকেই জানি ও বদলে যাবে। তা যাক্‌। কিন্তু ও আমার উপকার করতে

এসেছিল। ও আমাকে চাকরি দিতে চায়।

—এতে অপমানের কী আছে?

—সেইটাই তো কথা। ও এসে নানা কথা বললো। কাজের জন্য পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখাই করা হয় না!…এইসব…। আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি কী করছি এখন। তারপর সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলো, আমি একটা ভালো চাকরি পেলে নেবো কিনা। ফরাক্কা বাঁধে স্টোন চিপ্‌স সাপ্লাই করছে এক মাড়োয়ারী কম্পানি, তারা একজন বিশ্বস্ত লোক চায়। প্রত্যেকদিন দশ ওয়াগন করে পাথর কুচি সাপ্লাই করে। এখন বিহারের ধলভূমগড় কোয়ারি থেকে সাপ্লাই চলছে, কয়েক মাস বাদে যাবে বেথুয়াডিহি থেকে। একজন ম্যানেজার শ্রেণীর লোক চাই, ঠিক মতো চালান যাচ্ছে কিনা দেখবে, রেলওয়ের সঙ্গে কনট্যাক্ট রাখবে। অবিনাশ আমাকে ঐ চাকরিটা করে দিতে চায়! মাইনেই সাড়ে পাঁচ শো টাকার বেশী, ফ্রি কোয়ার্টার্স! ওখানে নাকি আমি লেখা-টেখারও অনেক সময় পাবো।

—শুনতে তো খারাপ লাগছে না। এতে তুমি এত রেগে উঠছো কেন?

—সেইতো! কেন? শুনতে একটুও খারাপ নয়। আমি এখানে ভালো চাকরি করি না। অবিনাশ আমার উপকারই করছে। বন্ধুর কাছে কেউ কখনো উপকার চায় না মুখ ফুটে, খাঁটি বন্ধুরাই নীরবে উপকারের সুযোগ এনে দেয়। সব ঠিক। কলকাতা শহর আমার ভালো লাগে না আর, আমি বাইরেই যেতে চাই। আমার কিছু বেশী টাকা দরকার। সব ঠিক, কিন্তু কেন?

—বাঃ, এর কোনো মানে নেই! এ তোমার—

—অনেকগুলো কেন ছুঁড়ে দেওয়া যায়। এনজিনিয়ারের সঙ্গে কন্ট্রাক্টরের কেন এত খাতির? অবিনাশ মাইনে না বলে 'মাইনেই' বলে কেন একটা অতিরিক্ত ই-কার জুড়ে দিলো? এসব সরল ব্যাপার সারা দেশেই চলছে। আমার কী আসে যায়, আমি শুধু আমার অংশটুকু খুঁটে নিতে পারলেই হলো। অবিনাশের প্রস্তাবে আমি প্রথমে কোনো উত্তর দিতে পারি নি। খুব লজ্জা করছিল, শুধু একবার চকিতে মনে হয়েছিল, ঐ চাকরিটা নেবার পর যদি কখনো আমি একটু দামী সুট পরি, অবিনাশ যখন সেটার প্রশংসা করবে তখন তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকবে, আমি চাকরিটা দিয়েছিলাম বলেই তো। সেটাও এমন কিছু না। প্রথমে আমার রাগ এলো আমার এখনকার অফিসের গজেনবাবুর ওপরে।

গৌরী হেসে উঠে বললো, অদ্ভুত নাম। তিনি আবার কী করলেন?

—তিনি আমার চাকরিটা এখনো পাকা করেন নি। পাকা চাকরি থাকলে প্রথমেই না বলতে পারতুম। দেখো, কেরানীর চাকরি করছি, এতে কোনো লজ্জা নেই। আমি কেরানী বলে অন্য কোনো বড়ো অফিসার-কে ঈর্ষা করি না। কিন্তু টেমপোরারি চাকরি বড়ো অপমানজনক। কেউ চাকরির কথা জিজ্ঞেস করলেই ভয় ভয় করে। এসব অফিসে, বছরের শেষে সি-

সি-আর বলে একটা ব্যাপার আছে। তাতে ঐ লোকটা মুচকি হেসে আমার নামে কী যেন লিখে রাখে। প্রোমোশান তো দূরের কথা, আমার চাকরিটাই এখনো পার্মানেন্ট করে নি, তা হলে আমি অনায়াসে ফুঃ করে অবিনাশের প্রস্তাব উড়িয়ে দিতে পারতুম। কারুর কাছ থেকে দয়া নেওয়ার চাইতে দয়া উপেক্ষা করায় আনন্দ বেশী না? গজেন আমাকে তা থেকে বঞ্চিত করেছে—

—তুমি জিনিসটাকে এত ঘোরালো করছো কেন? কেউ কোনো ভালো চাকরির খোঁজ পেলে বন্ধু-টন্ধুদের বলে না?

—এর নাম ভালো চাকরি? এঁদো গ্রামে গিয়ে কুলির সর্দারি? যাই হোক, আমার তুলনায় ভালো। আমার না নেবার কোনো যুক্তি নেই। কিন্তু আর একটা কেন-র কথা বলি। এই চাকরির পুরো প্রস্তাবটাই কি রকম ফাঁকা ফাঁকা নয়? যেন, মনে হয় আমারই জন্য তৈরি করা? অবিনাশকে আমি অবিশ্বাস করি না—কিন্তু প্রথম থেকে শুরু করি, অবিনাশ আজ সকালে আমার বাড়ি এলো কেন? তুমি এর উত্তর দিতে পারো? ও তো আমায় টেলিফোন করতে পারতো? তা ছাড়া, অবিনাশ আর আমি এখন সত্যিকারের বন্ধু নই, এ কথা আমরা দু'জনেই মনে মনে জানি। তবু ওর এত গরজ কেন? একজন ব্যস্ত লোক, বড় চাকরি করছে, সে কোনো অফিসের দিনে সকালে অতদূরে কোনো সাধারণ বন্ধুর বাড়িতে যায়? তাও বহু বছর আগে ধার করা টাকা শোধ দেওয়ার ছুতো করে? তার মানে অবিনাশ বেশ কয়েকদিন ধরে আমার কথা ভেবেছে। আমার চাকরির চেষ্টা করেছে। কেন?

—কেন?

—তার কারণ, গৌরী, আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, অবিনাশ চায় আমি কলকাতা থেকে দূরে থাকি। কোনো কারণে এখন অবিনাশ আমাকে কলকাতা থেকে সরিয়ে দিতে চায়। অবশ্য, ওর সঙ্গে আমার কোনোই যোগাযোগ নেই, তবু কেন চাইছে জানি না। কিন্তু চাইছে ঠিকই। এই কথা বুঝতে পেরে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করে অপমানে। তখন আমার মনে হয় অবিনাশের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমার একটা প্রবল যুক্তি চাই। তা খুঁজে না পেয়ে আমার রাগ বাড়তে শুরু করে, অবিনাশের ওপর, গজেনের ওপর, দুনিয়ার যাবতীয় কন্ট্রাকটার এবং এঞ্জিনিয়ারদের ওপর। আমি মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে বসেছিলাম, কিন্তু আমার রাগ সারা ঘর ভরে হা-হা করছিল।

—নীলুদা, তোমার মাথাটাথা খারাপ হয়ে যায় নি তো? তুমি তো ঠাণ্ডা ভাবে কথা বলছো, কিন্তু তোমার কথায় কি রকম পাগল পাগল যুক্তি আছে।

—তা নয়, আসলে কোনো যুক্তিই নেই। এইটাই আজ সকালে আমি আবিষ্কার করলুম। আজ বুঝতে পারলুম, যে-কোনো যুক্তিই আসলে কাপুরুষতা। এ পৃথিবীর যে-কোনো সাহসিকতাই অযৌক্তিক। আমি যুক্তি

মানার চেষ্টা করেছি এতকাল, আর প্রত্যেকটা লোক আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে। আমি মানুষের কাছ থেকে ভদ্রতা, বিনয়, স্বাভাবিকতা চেয়ে নিজে ভদ্র, বিনয়ী স্বাভাবিক হয়ে থেকেছি, আর তারা ঠা-ঠা করে হেসে কাদামাখা নোংরা পায়ে আমার সামনে দিয়ে এগিয়ে গেছে। পিছিয়ে যেতে যেতে আজ আমি কোথায় চলে এসেছি, একটা ঝাপসা অস্বস্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, বত্রিশ বছর বয়েস—জুলপিতে সাদা ছোপ, এক একদিন বিকেলবেলা পথে একা দাঁড়িয়ে মনে হয়, আমার কোথাও যাবার নেই। এরকমভাবে চললে আমি মাটির নিচে ঢুকে যাবো।···আজ সকালে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি আজ থেকে আমি প্রতিশোধ নেবো। অবিনাশই প্রথম!

গৌরী টেবিলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে আমার একটা হাত চেপে ধরে বললো, তুমি অবিনাশকে নিয়ে কি করতে চাও?

আমি সামান্য হেসে বললুম, এখনও জানি না। অবিনাশের জন্য ভয় পেয়ে তুমি আমাকে ছুঁয়ে দিলে?

—কেন, তোমাকে ছোঁয়া বারণ না কি?

—অন্যরকম কথা ছিল!

—কী ছেলেমানুষ তুমি এখনও। আজও অভিমান গেল না? নীলুদা, তোমার মুখের চেহারা কেমন রুক্ষ হয়ে গেছে, চোখ দুটো বড় বেশী জ্বলজ্বলে! তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে খুব, তুমি অনেক বদলে গেছো।

—কে না বদলেছে? ঐ অবিনাশটাকে এক সময় গ্রাহ্যই করতুম না, আজ কি রকম অহংকারীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে মাথা ঝাঁকিয়ে।

—আমার সামনে অবিনাশের নিন্দে করা তোমার উচিত নয়। তোমাকে মানায় না। অবিনাশের সঙ্গে সামনের মাসে আমার বিয়ে হবার কথা।

—তুমিও অনেক বদলে গেছো, গৌরী।

—অনেক, অনেক! এখন আমি জানি সারাজীবনে আর বৃষ্টিতে ভিজতে পারবো না, দু বেলা ঠিক সময়ে খেতে হবে, বেশী চা খাওয়া চলবে না আমার ···আমার একবার রিলাপ্স করেছিল, জ্যোৎস্নারাত্রে শখ করে হাঁটতে পারবো না।

—হঠাৎ পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবো না।

গৌরী একটু থেমে কি যেন মনে করার চেষ্টা করলো। হয়তো কিছুই মনে পড়লো না। সব কিছু বুঝি আমারই একা মনে আছে! গৌরীর সুন্দর মুখটা ম্লান হয়ে এলো, কি রকম অসহায় কুয়াশা মাখা মুখ, আমার হাতটা চেপে ধরে থেকেই আস্তে আস্তে বললো, এসবই এখন আমাকে মানতে হয়। এই সবই আমার বেঁচে থাকার যুক্তি। একটা না মানলেই একলা ঘরের বিছানা। তখন মাথার কাছে বসে যদি কেউ ভালোবাসার কথা বলে, একটুও ভালো লাগে না। ····এই দেখো না, এতক্ষণ যে চেয়ারে বসে আছি, পিঠ টন্‌টন্ করছে।

—গৌরী, আমার কথা কি তোমার মনে পড়তো!

—মনে পড়বে না কেন? তবে খুব যে একটা হা-হুতাশ বা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে, তা যেন মনে করো না! এমনই। তবে মাঝে মাঝে মনে হতো, আমি তোমার প্রতি কোনো অন্যায় করেছি। মিথ্যে কষ্ট দিয়েছি।

—না, না, তা নয়। আমি ও কখনও ভাবিনি। তোমার কথাও প্রথম কিছুদিন খুব মনে পড়তো। তারপর, দেখা না হতে হতে ভুলে গেছি। এখন কোনো দুঃখ নেই, রাগ নেই।

—তুমি আমার ওপর কোনো প্রতিশোধ নেবে না?

—না, না, কেন? কি জন্য? তা ছাড়া, তুমি তো আগে থেকেই হেরে বসে আছো দেখছি।

—হয়তো, তুমি ভাবছো, অবিনাশের ওপর আঘাত করলেই আমাকে আঘাত করা হবে। অবিনাশই আমার এখন একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু তা বলে আমি এখনও এত দুর্বল হয়ে পড়িনি যে তোমার কাছে অবিনাশের জন্য মিনতি করবো। তোমাকে বারণ করবো। ওসব তোমাদের পুরুষদের বোঝাপড়া আর পাগলামি।

—অবিনাশের সঙ্গে সাতটার সময় আমার দেখা হবে। তুমি থাকবে আমাদের সঙ্গে?

—কোথায়?

—পার্ক স্ট্রীটের মুখে।

নাঃ! আমার ক্লান্তি লাগছে, বাড়ি যাই। অবিনাশের ওপর যদি তুমি প্রতিশোধ নিতেও পারো, তারপর কিন্তু আবার আমাকে ডেকো না। আমি জুয়া খেলার বাজি নই। অবিনাশ তোমাকে কলকাতা থেকে সরিয়ে দিতে চায় এ কথা বলে তুমি এরকমই কিছু বোঝাতে চেয়েছিলে। কিন্তু, আমি তো তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি না!

—তা তো জানিই, গৌরী। আবার কেন বললে!

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলুম। অন্ধকার হয়ে এসেছে অনেকক্ষণ। গৌরী ওর ডান হাতটার মুঠো খুলে বললো, দেখো, কি রকম হাত ঘেমেছে আমার! আজকাল এরকম হয়। আমি গৌরীর হাতটা তুলে নিলাম। নরম, বড় বেশী নরম, আগের মতন অমন তাপ নেই। আমার আঙুলের নোখ সিগারেটের ধোঁয়ায় হলুদ, গৌরীর হাত ও আমার হাত, দুটোই যেন অন্য কোনো নারী-পুরুষের হাত। অথবা নিয়ন আলোতে অন্য রকম দেখায়।

বাস স্টপ পর্যন্ত হেঁটে গেলাম দুজনে। একটা বিশ্রী চেহারার ছোকরা গৌরীর গায় ইচ্ছে করে একটা ধাক্কা দিয়ে গেল। গৌরী তাতে ভ্রূক্ষেপ করলো না। আমি অজান্তে বুকের কাছে ভোজালিতে একবার হাত দিয়েছি। তারপর একটুকু এগিয়ে গিয়ে আমি সেই শৌখিন ছেলেটার পা মাড়িয়ে দিলাম আমার শক্ত জুতো দিয়ে। ছেলেটা রুখে দাঁড়ালো না, চট্ করে আমার দিকে ফিরে 'একস্কিউজ মি' বলে

হন-হন করে চলে গেল।

এই সময়টায় বাসে বিষম ভিড়। গৌরী উঠবে কী করে? হয়তো আমারই উচিত ওকে বাড়ি পেঁছে দিয়ে আসা। থাক তার দরকার নেই। একটা ফাঁকা লেডিস বাস এসে হাজির। বাস ছাড়ার পর ক্লান্ত মুখে ভারী মধুর করে হাসলো গৌরী আমার দিকে চেয়ে। আমি ফিরে এলাম। প্রায় সাতটা বাজে। এখন থেকে পার্ক স্ট্রট পর্যন্ত হেঁটেই যাবো ঠিক করলুম। রাস্তায় এত ভিড় অথচ আমি হেঁটে যাবার সময় আমার প্রত্যেকটি পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমার জুতোয় টকটক শব্দ হচ্ছে। খুব বেশী তাড়া নেই, বহুদিন এমন খুশী বোধ করিনি, বেশ হাল্কা শরীরে চলে এলাম পার্ক স্ট্রীট পর্যন্ত। অবিনাশ তখনও আসে নি।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। অন্তত এক ঘণ্টার কম নয়। অবিনাশ শেষ পর্যন্ত আসবে না, তা বিশ্বাসই হয় না। মহাত্মাজীর মূর্তির ওপর আলো পড়েছে. তার কাছেই ট্রাফিকের লাল আলোয় যখন অসংখ্য মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে যায় তখন মনে হয়, গান্ধীজীই যেন ডান হাত তুলে গাড়িগুলোকে দাঁড়াতে বলেছেন। মোটরগুলি, ভারী ভারী দোতলা বাস সেই হুকুম অমান্য করতে পারছে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসছে, অপেক্ষা করছে, কখন তিনি আঙুলের ইশারা করে লালকে বলবেন সবুজ হতে, সকলকে বলবেন, যাও। বারবার এই জিনিস দেখতে আমার বেশ মজা লাগছিল। মহাত্মাজীর হাতের সামনে এসে গাড়িগুলো থামছে, ভেতবে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা নারী পুরুষরা ঝট করে আলাদা হয়ে সরে বসছে,কেউ একটাও কথা বলছে না, আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখছি, কখন তাঁর আঙুল নড়ে ওঠে। ঐ নড়ে উঠলো, তিনি বললেন, যাও।

এই রকম দেখতে দেখতেই, অনেক সময় কেটে গিয়েছিল। এমন সময় অবিনাশ এলো, হালকা সুট পরেছে, টাই-এর ফাঁস আলগা, মাথার চুলগুলো খাড়াখাড়া। এসে বললো, কী রে, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস? ভেবেছিলুম চলে যাবি! তবে চাকরি এমন জিনিস···হুঃ নিবি তা হলে?

অবিনাশ অনেকটা মদ খেয়ে এসেছে, সোজা হয়ে এখনও দাঁড়াতে পারলেও কথা বলছে গলা উঁচু করে। বাঁ হাত দিয়ে মাথার চুল খিমচোচ্ছে মাঝে মাঝে। আমি চোয়াল শক্ত করে বললুম, চল্, রাস্তার ওপাশে গিয়ে মাঠে বসি।

—মাঠে কেন, কোনো দোকানে চল না।

—না, এতক্ষণ চায়ের দোকানেই বসেছিলাম। গৌরীর সঙ্গে দেখা হলো।

—গৌরী? কেন, আচ্ছা যাক্‌গে! গৌরীর সঙ্গে তোর দেখা হলো, বললি? কেন?

—কেন মানে? দেখা হলো—চল্ গিয়ে বসি মাঠে কোথাও!

—তারপর মাঠে বসে কী করবো?

—অবিনাশ, তুই-ই আমাকে এখানে আসতে বলেছিস আজ।

—মাঠে গিয়ে ঘাস খাবার কথা বলিনি।

—তুই এ-রকম বিশ্রীভাবে কথা শুরু করলে কোনো কথাই বলা যায় না।

—বিশ্রী সুচ্ছিরির কী আছে বাবা। চল্ যাই মাঠেই—রাস্তা পার হবার জন্য আমি অবিনাশের একটা হাত ধরলুম। অবিনাশ হঠাৎ একটা হুংকার দিয়ে বললো. হাত্ ছাড। আমি হাঁটতে পারবো না ভেবেছিস্? দু'চার পেগে কিস্যু হয় না অবিনাশ মিত্তিরের। ভেবেছিলুম, তোকেও এসে ডেকে নিয়ে যাবো. কিন্তু এমন জমে গেলুম! আজকাল এত খাওয়াবার লোক না চারিদিকে! ঝাঁকে ঝাঁকে, অনেক পান্টার সব ব্ল্যাকমানি, বুঝেছিস্ তো। তুই তা হলে নিবি তো চাকরিটা।

মহাত্মাজীর মূর্তিটার পিছন দিক দিয়ে এসে. পুকুরের পাড় দিয়ে আমরা ওপাশের অন্ধকার মাঠে এলুম। অবিনাশকে বললুম, আয় বসি এখানে। তারপর কথা হবে। অবিনাশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বললো, না, সময় নেই। আমি আবার যাবো। কী রকম অ্যাপ—অ্যাপ—অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক রেখেছি. বল্! তুই চাকরিটা নিয়ে নে। তারপর আমি তোকে আলাদা কন্ট্রাক্টারি পাইয়ে দেবো। বহু টাকা, মাইরি. একবার ঢুকে দ্যাখ··· চল্. এক্ষুনি দেখা করিয়ে দিচ্ছি।

নিজের চোখে নেশা না থাকলে মাতালদের সঙ্গে কথা বলতে আমার একেবারে ভালো লাগে না। এমন বাজে বকে যে কোনো উত্তরই দেওয়া যায় না। আমি এক ধমক দিয়ে বললুম. একটু চুপ করে বসবি!

অবিনাশ চোখ পাকিয়ে বললো, অ্যা-ই! ধমকাচ্ছিস্ কি? ভেবেছিস বন্ধু বলে রেয়াৎ করবো? একখানা নাকে ঝাড়বো এমন, বিন্দাবন দেখিয়ে দেবো। হাতে জোর আছে এখনও, শুধু সময় নষ্ট।

—তুই আমাকে চাকরি দেবার জন্য ব্যস্ত কেন?

—ব্যস্ত? কত লোক ফ্যা-ফ্যা করছে একবার ডাকলেই···তোকে ভালোবাসি বলে···তুই কষ্টে আছিস···নে না. তোকে আমি দাঁড় করিয়ে দেবো।

—অবিনাশ. তুই এইরকমভাবে কথা বলা বন্ধ করবি কি না?

—আবার চোখ রাঙানো! এই জন্যই তোকে আমি দেখতে পারি না। দু'চক্ষে দেখতে পারি না। একটু কৃতজ্ঞতা নেই! গৌরীর সঙ্গে তোর হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বুঝি? হঠাৎ? একবারে রাস্তার মাঝখানে—থাক্‌গে, অন্য কথা। এ রকম একটা চান্স দিচ্ছি···ঐ যে কি বলে, লছমনপ্রসাদ শুয়ারের বাচ্চাকে কত করে বুঝিয়ে তবে—আর, তুই শুয়ারের বাচ্চা।

—অবিনাশ, আমার সঙ্গে এরকমভাবে কথা বলার সাহস তোর হলো কী করে রে?

—সাহস? তুই কে-রে? একটা যাকে বলে, ঐ যে কি যেন, আমাকে তুই সাহস দেখাতে এসেছিস্?

অবিনাশের মুখটা ঝুলে ঝুলে পড়ছিল। ক্রমেই ওর নেশা বেড়ে যাচ্ছে! যদি খুব বেশী খেয়ে থাকে, তবে এখন ঘণ্টাখানেক নেশা বেড়েই চলবে। আমি হাত দিয়ে ওর মুখটা উঁচু করে তুলে বললুম, কি ব্যাপার? তোর কি চাই?

—আমার আবার কী চাই। তোকেই তো পাইয়ে দিচ্ছি!

—গৌরীর সঙ্গে দেখা হয়েছে শুনেই।

—চোপ!

আচমকা অবিনাশ আমার নাকে একটা ঘুষি মেরেছে। বেশ জোরেই, আমি হাত দিয়ে দেখলুম নাকের কাছটা ভিজে ভিজে, বোধহয় রক্ত বেরিয়েছে। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিলাম। অন্ধকারে রক্ত দেখা গেল না অবশ্য। মারের ঝোঁকে অবিনাশ নিজেও পড়ে গেছে মাটিতে।···আমি এক ঝলক সেদিকে তাকিয়ে দেখলুম, ঘাসের ওপর অবিনাশ লম্বা হয়ে শুয়ে আছে উপুড় হয়ে, ঘাড়ের কাছে একটা ভোজালি বিঁধে আছে আমূল, ভোজালির বাঁটটা শুধু বেরিয়ে আছে, জ্যোৎস্না লেগে চক্‌চক করছে সেটা। আমি হাঁটু গেড়ে বসলুম ওর পাশে।

আমি ধাক্কা দিকে ডাকলুম অবিনাশ, অবিনাশ! অবিনাশ চোখ খুলে বললো, সুনীল? আমি তোকে মারলুম? অ্যাঁ? আমি তোর জন্য আমি তোকে, তুই জানিস না, তোর জন্য আমি কতখানি···তোকে মারলুম?

—অবিনাশ, তুই আমাকে কলকাতার বাইরে পাঠাতে চাস কেন?

কলকাতার বাইরে? কলকাতার বাইরে ভেতরে মাঝখানে যেখানে ইচ্ছে থাক না, আমার কি···আমি শুধু টাকার জন্য ··এত টাকা চারদিকে—

—তুই কি গৌরীর কথা ভেবে আমাকে—

—গৌরী?

অবিনাশ হঠাৎ বিপন্ন মানুষের মতো ধড়মড় করে উঠে বসে আমার হাত জড়িয়ে ধরলো, তারপর ব্যাকুলভাবে বলতে লাগলো, গৌরী? ঠিক বলেছিস্‌, এতক্ষণ এ কথাটাই আমার মনে পড়ে নি। ঐ জন্যই তোকে খুঁজছিলাম। ঐ জন্যই তোর কাছে···আসল কথাটাই বলা হয় নি। গৌরীর সঙ্গে তুই আজ কি বলে দেখা করলি? মাঝে মাঝেই এখনও দেখা হয়? না-রে?

—তিন বছর পর আজই প্রথম দেখা হলো।

—যাঃ! বাজে কথা বলিস কেন? তুই তো গৌরীকে ভালোবেসে পাগল ছিলি না?

—না। কোনোদিন না। এক সময় ভালোবাসার চেষ্টা করেছিলুম। এখন আর চেষ্টা করারও ইচ্ছে নেই। আমার দিক থেকে তোর কোনো ভয় নেই।

—ভয়? আমার বড্ড ভয় রে—

অবিনাশ রুমাল বার করে নাক ঝেড়ে সুস্থ হবার চেষ্টা করলো। মাথার

চুলগুলো খিমচে ধরে নিজেই মাথাটা তুলে মুখ আকাশের সমান্তরাল করে ফাঁকা গলায় অবিনাশ বললো, আমার বড্ড ভয় করে রে! কোনদিন গৌরীর কাছে ধরা পড়ে যাবো, আমি ওকে একটুও ভালোবাসি না। একটুও না! তুই যদি ওকে ভালোবাসতিস্, কি চমৎকারই না হতো। আমি বাঁচতুম মাইরি, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই না, একদম চাই না।

— সামনের মাসে নাকি তুই ওকে বিয়ে করছিস্?

—কে জানে কাকে বিয়ে করবো! যদি শান্তার সঙ্গে।

—শান্তা!

—তুই জানিস্ না, উফ্ কল্পনা করতে পারবি না—একদিন শান্তাকে চুমু খেয়েছিলাম, উফ, বুক জ্বলে গেছে, জ্বলে গেছে—ওসব গৌরীকে ফৌরিকে আমি চাই বলার কোনো মানে হয় না। শখ করে না—শান্তা—

অবিনাশ গুন্‌গুন্ করে অবিশ্রান্ত কথা বলতে লাগলো। আমি ঠাণ্ডা হয়ে বসে রইলুম। শান্তা একদিন জলে ডুবে গিয়েছিল, বারবার শান্তার সেই মুখটাই আমার মনে পড়ছে, জলে-ডোবা অসহায় শিশুর মুখ। কি জানি শান্তা এখন কত বড় হয়েছে! হঠাৎ মনে পড়লো, বাস স্টপ পর্যন্ত গৌরীর সঙ্গে হেঁটে যাওয়া, সব তেজী মুখের রেখা মিলিয়ে গিয়ে গৌরীর এখন শান্ত ভঙ্গি, বেশীক্ষণ বসে থাকলে ওর পিঠের শিরদাঁড়ায় ব্যথা করে।

অবিনাশ বললো, গৌরীকে এড়িয়ে কি করে শান্তাকে পাবো বলতো! শান্তাকে একদিন আদর করে জড়িয়ে ধরেছিলুম, ঠিক আমার বুকের মাপে মাপে বুঝলি, আমার বুকের মধ্যে ওর পুরো শরীরটা এমন খাপ খেয়ে গেল—কিন্তু গৌরীকে নিয়েই হয়েছে ঝঞ্ঝাট! কি ঝামেলার মধ্যে আছি, তুই যদি জানতিস্ ···গৌরীকে বিয়ে না করলে শান্তাও বোধ হয় আমার দিকে ফিরে তাকাবে না—পারে কখনো, নিজের দিদিকে কেউ অপমান করলে···গৌরীটা মরে না কেন? কিংবা আর কারুর সঙ্গে প্রেম ফ্রেম্···

—এ সব কথা আমার সঙ্গে কেন? আমি তোকে সাহায্য করবো ভেবেছিস?

—মাইরী, তুই আমায় সাহায্য কর! আমি তোর কেনা হয়ে থাকবো। আমি তোর জুতো মুখে করে নিয়ে যাবো। অনেকদিন ভেবে তোর কথা মনে পড়লো। আহা, তুই গৌরীকে অত ভালোবাসতিস? তোর মনে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। তোর মতো এমন ভালো ছেলে···

অবিনাশের পাশে বসে থাকতে আমার বিষম বিরক্ত লাগছিল। ওর দিকে তাকাতেই ইচ্ছে করছে না। মাঝে মাঝে ও যে আমার গায়ে হাত দিচ্ছে, আমার অস্বস্তি লাগছে। ওর মুখ দিয়ে বিকট গন্ধ বেরুচ্ছে, এখন কথা জড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই থুতু ফেলছে একবার করে, ফ্যাৎ-ফ্যাৎ করে নাক ঝেড়ে আবার সেই হাতে আমাকে ধরতে আসছে বলে আমি একটু সরে সরে বসছি। হঠাৎ গা গুলিয়ে

উঠলো। আমি অবিনাশকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললুম, যা বাড়ি যা? আমার কাছে আর কোনোদিন আসিস না—

—ওফ্, শান্তার জন্য বুকটা জ্বলে গেল, এত—টাকা রোজগার করছি, অথচ ইচ্ছেমতো কত বড়ো বড়ো পার্টিতে যাই, সেখানে শান্তা সঙ্গে থাকলে, ওফ্, মক্কেলরা একেবারে সেঁটে থাকবে। মাথা ঘুরে যাবে মাইরি, তুই জানিস না, শান্তা···তা নয় গৌরীর জন্য আমার কেরিয়ারটা ভুম করা···একটা পোকায় খাওয়া মেয়ের ভালোবাসা কে চায়?

আমি উঠে একা হাঁটতে আরম্ভ করতেই অবিনাশ চেঁচিয়ে বললো এই কোথায় যাচ্ছিস? আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দে··চলে যাসনি! একটু ধর্ উঠতে পারছি না।

অন্ধকারের মধ্যে আমি ফিরে তাকালুম। মাঠের মধ্যে এক স্তূপ আবর্জনার মতো অবিনাশ এলিযে পড়ে আছে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়েই রইলুম। অবিনাশ অনবরত চেঁচাচ্ছে। শব্দ শুনে একটা চিনেবাদামওলা এদিকে দেখতে এলো। আমি ফিরে গিযে হাত ধরে অবিনাশকে টেনে তুললাম। অবিনাশ বললো, পড়ে যাবার সময় হাতে বড্ড লেগেছে রে! দেখতো ভেঙেছে না কি? একটু ঝাঁকানি দিযে টিপে-ফিপে দেনা! অবিনাশের গা ছুঁতে আমার ইচ্ছে করলো না। আমি বললুম, কিছু হয় নি, যাঃ! অবিনাশ নাকি সুরে বললে, নারে, হাতের মুঠোয় খুব লেগেছে। উফ্। ঠাণ্ডা জল দিয়ে একটু রগড়ে দে না! তোর লাগে নি?—আমি কোনো উত্তর দিলাম না।—বিজ্ঞাপনের লাল আলো-গুলোর দিকে চোখ রেখে এগিয়ে গেলাম রাস্তার দিকে। সহজেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে ও বললো, তুই-ও আমার সঙ্গে চল্ না—

আমি নীরস গলায় বললুম, না।

—চল্ না। দুজনে মিলে গৌরীর কাছে যাই।

—না। তুই আর আমার কাছে কোনো দিন আসিস না।

—আঃ! যত তোর বাজে কথা। বেশ করবো আসবো। এখন চল্ না, দু'জনে যাই—

—না! আমি প্রায় জোর করেই অবিনাশকে ট্যাক্সিতে তুলে দিলাম। সেটা চলে যেতেই কান দুটো বেশ ঠাণ্ঠা লাগলো। এতক্ষণ ধরে অবিনাশের একঘেয়ে ঘ্যান ঘ্যানানিতে কানের ফুটো দু'টো যেন ভরে যাচ্ছিল। এখন ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে টের পাচ্ছি। পুকুরের পাড়ে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়ালুম। এখানে কিছু কিছু লোক আছে। এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি, আজকের রাতটা বেশ চমৎকার, খুব শীত নেই—বরং মাঠভর্তি ঠাণ্ডা আলো ছায়া। এখানে কিছুক্ষণ একা দাঁড়িয়ে থাকতে খুব খারাপ লাগার কথা নয়। কোথা থেকে যে অবিনাশের মতো লোকেরা এসে হাজির হয়, একলা থাকতে দেয় না। এই রকম জলের ধারে তো একা দাঁড়ানোই ঠিক, আর কিছু তখন মনে পড়ে না, নিজেকে খুব ভালো-

বাসতে ইচ্ছে হয়।

বুকের কাছটা ভারী ভারী লাগছে। ও, ভোজালিটার জন্য। পকেটে নোটবই বা মনিব্যাগ রাখার অভ্যেস নেই আমার, আর সারা দিন একটা ভারী জিনিস বয়ে বেড়াচ্ছি। ইচ্ছে হলো, ভোজালিটা গোপনে বার করে জলের মধ্যে ফেলে দিই। ঝুপ করে একটা শব্দ হবে শুধু। ডুবে যাবে না ভাসবে? খাপ সুদ্ধু ফেললে, ডুবে যাবে কি না ঠিক বলা যায় না। ডুবুক আর ভাসুক, এটাকে ফেলার কোন মানে হয় না, শখ করে কিনেছিলাম! বরং এটাকে দেয়ালেই ঝুলিয়ে রাখবো আবার। অবিনাশকে তো আমার ছুঁতেই ইচ্ছে করলো না, দেখা যাক অন্য কারুকে বেছে নিয়ে আবার প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা শুরু করা যায় কি না।

দরজার আড়াল থেকে হীরেন দেখতে পেল, ওর স্ত্রী ললিতাকে ওর বন্ধু হেমকান্তি চুমু খাচ্ছে। হীরেন একটু হাসলো।

হীরেন চিঠি ফেলতে গিয়েছিল, কাল বিকেলবেলা বেড়াতে গিয়ে ওরা যে দোকান থেকে ঢাকাই পরোটা খেয়েছে, তার পাশেই অশ্বত্থগাছের সঙ্গে লাগানো ডাকবাক্স, হেমকান্তির কাছে ডিরেকশন শুনে নিয়ে হীরেন সেটা ঠিকই চিনতে পারতো, এবং তাহলে চিঠিটা ফেলে আসতে হীরেনের সময় লাগতো বারো মিনিট, মেরে কেটে দশ মিনিট তো বটেই। তা বলে হীরেন যে অন্য সময় অনুপস্থিত থাকে না তা নয়, বা কালকে বিকেলেই তো বেড়াবার সময়, একটা লোকের হাতে বেতের তৈরি ব্যাগ দেখে হীরেন এমন মোহিত হয়ে যায় যে, সেই লোকটির সঙ্গে বেত-শিল্প বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা জুড়ে দেয়, বিরক্ত হয়ে সেই মন্থর অবসন্ন সন্ধ্যায় ললিতা ও হেমকান্তি আলাদা হাঁটতে থাকে মাঠের মধ্যে, অনেক দূর চলে গেলে হেমকান্তি চেঁচিয়ে বলেছিল. এই হীরেন, আমরা খালের ধারে গিয়ে বসছি! তুই আয়—এ কথা বলারও অনেকক্ষণ পর হীরেন এসেছিল।

সুতরাং এখন এই চিঠি ফেলতে যাবার দশ মিনিটের কোনো আলাদা মূল্য নেই, শুধু, হীরেন যদি সত্যি সত্যি দশ মিনিট ব্যয় করতো, তাহলে এই দৃশ্যটা তাকে দেখতে হতো না। কারণ, ললিতা ও হেমকান্তি এ বিষয়ে মুখে কিছু আলোচনা না করে নিলেও দু'জনের মনে মনে নিশ্চিত ছিল, এখন সময় আছে দশ মিনিট এবং ললিতা ঝট্‌কা মেরে হেমকান্তিকে ঠেলে দেবার সময় বলেছিল, কি করছেন কি! আপনি পাগল, এক্ষুনি ও এসে পড়বে—। হেমকান্তি বলেছিল, না, আসবে না, একবার, একবার—

কিন্তু হীরেন দশ মিনিট খরচ করে নি। সেটা ঠিক তার দোষও নয়। হীরেনের হাতে ঘড়ি নেই, কিন্তু বোধ হয় ও সাড়ে তিন কি চার মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসেছে। এই অসময়ে ফিরে আসার জন্য পরোক্ষে হেমকান্তিই দায়ী। পিসীমাকে বলে এসেছিল পেঁৗছ-সংবাদ দেবে, কিন্তু যে দিন হীরেনরা হেমকান্তির কাছে এসে পেঁৗছোয় সেদিন শনিবার বিকেল, পরদিন রবিবার ডাক বন্ধ, আজ সোমবার সকালে চা-পর্ব শেষ করার পর, হীরেনেরই মনে পড়ে চিঠি লেখার কথা, ওর সুটকেসেই পোস্টকার্ড ছিল, হীরেন একাপিঠে লেখার পর অন্যদিকে ললিতা

পিসতুতো বোন বুলুকেও কয়েক লাইন লিখে দেয়, হেমকান্তি তখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে দাড়ি কামাচ্ছে, ললিতা মুর্গীর মাংসের গা থেকে পালক ছাড়াচ্ছে, সে-সময় হীরেনের ঠিক কিছুই করার নেই ভেবে সে নিজেই চিঠিটা ফেলে আসার কথা ভাবলো, চাকর এই মাত্র বাজার থেকে এসেছে, তাকে আবার এখুনি পাঠানো ঠিক নয়।

পরনে সিল্কের লুঙ্গি ছিল, তার ওপর পাঞ্জাবিটা চাপিয়ে নিয়ে হীরেন যখন বেরুবে, তখন হেমকান্তি চেঁচিয়ে বলেছিল, সিগারেট নেই, দু' প্যাকেট সিগারেটও আনিস তো! হীরেন আচ্ছা বলে বেরিয়ে যায়, ভুজাওয়ালার দোকান পর্যন্ত পোঁছেই ওর মনে পড়ায় পকেটে হাত দিয়ে দেখে যে পকেট ফাঁকা। কাল রাত্তিরে, হেমকান্তি বলেছিল এখানে বড় চোরের উপদ্রব, তাই হীরেন পকেট থেকে টাকাকড়ি ও খুচরো পয়সা পর্যন্ত সবই সুটকেসের মধ্যে রেখেছিল। তাহলে সিগারেট কেনার পয়সা আনার জন্যই তাকে ফিরতে হয়।

হীরেন ভেবেছিল বাড়িতে অ র না ঢুকে জানলা দিয়েই পয়সা নেবে। কিন্তু তখন মনে পড়ে, উঠোনের রোদে বসে হেমকান্তিকে ও দাড়ি কামাতে দেখে এসেছে, ললিতাও রান্নাঘরের সামনে বারান্দায়, সুতরাং ওরা কেউ শুনতে পাবে না। হীরেন তাই বাড়ির মধ্যে ঢুকে বৈঠকখানা পেরিয়ে, হেমকান্তির ঘর পেরিয়ে, নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় হেমকান্তির ঘরের একপাল্লা ভেজানো দরজা দিয়ে একেবারে ওপাশের দেয়ালের কাছে সেই চুম্বনের দৃশ্য দেখতে পায়।

ঠিক ওদের না দেখলেও, হয়তো আলমারি—জোড়া আয়নায় ওদের ছায়া দেখেছিল, মোট কথা হীরেন দেখেছিল মাত্র এক ঝলক, ললিতার চুলের মধ্যে হেমকান্তির হাত ও মুখের কাছে মুখ। আর হীরেন কয়েকটা কথাও শুনতে পেয়েছিল, সে কথাগুলো ছবির মতন, সব দেখতে পাওয়া যায়। উঠোনে হেমকান্তির দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম ছড়িয়ে আছে, রান্নাঘরের বারান্দায় রাখা আছে আনাজ ও মাংস, চাকর বাথানি বাইরের কুয়ো থেকে জল তুলছে। হীরেন একটু হাসলো।

অন্তত দশ মিনিট হীরেনের বাইরে থাকার কথা ছিল, তার মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন কি চার মিনিটে ফিরে এসেছে। না এলেই ভালো হতো। এই দশ মিনিটের দাম বড় কম নয়, হয়তো সারাজীবন। দশ মিনিট বাদে এলে ওরা নিশ্চয়ই সাবধান হয়ে যেতো, ওরা দু'জনের কেউই তো কাণ্ডজ্ঞানহীন নয়।

হীরেন এক মিনিট কি দেড় মিনিট ওখানে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপরই মনে পড়লো, হঠাৎ ওরা ওকে এখন দেখতে পেলে ব্যাপারটা বিশ্রী লজ্জাজনক হয়ে পড়বে। ওরা দু'জন হয়তো ভাববে, হীরেন আগে থেকেই ওদের সন্দেহ করেছিল বলেই গোপনে ফিরে এসে চোরের মতন দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে হীরেনের এই কথাই মনে হয়, সে মোটেই এমন খুঁতখুঁতে ও অনুদার নয় যে বন্ধুকে সন্দেহ করবে। বন্ধুর সঙ্গে নিজের স্ত্রীকে একা রেখে সন্দেহবশে আড়ি

পেতেছে—ওরা যদি তাকে দেখে এখন সেই কথা ভাবে, সেটা খুবই অন্যায় হবে।' হীরেন ঘৃণাক্ষরেও এ সব কিছু ভাবে নি, সেইটা প্রমাণ করার জন্যই যেন তার সেখান থেকে তখুনি চলে যাওয়া দরকার।

তাছাড়া, দ্বিতীয় কারণটি এই, এখুনি যদি তারা দু'জনে তাকে দেখে ফেলে, তা হলেই ব্যাপারটা সারা জীবনের মত স্থায়ী হয়ে গেল, হেমকান্তির সঙ্গে সে ঝগড়া করতে বাধ্য হবে। ঘটনাটা দু'জনের কাছেই জানাজানি হয়ে গেলে—তারপর আর শান্তভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, ললিতার সঙ্গেও তার সম্পর্ক কি দাঁড়াবে কে জানে—শেষ পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদ কিংবা আত্মহত্যায় পর্যন্ত গিয়ে ঠেকতে পারে। অথচ সামান্য একটা চুমুর জন্য, দেখে ফেলার জন্য—।

এখানেই হীরেন একবার হাসলো। ভাবতে ভাবতেই আরও তিন-চার মিনিট কেটে যায়, চুম্বন শেষ করে ললিতা ও হেমকান্তি একটু দূরে সরে গিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। এই অবসরে হীরেন খুব সাবধানে আবার উঠোন পেরিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে। নিজের বাড়ি থেকে তাকে সন্তর্পণে লুকিয়ে বেরুতে হচ্ছে, এটাও একটা হাসির ব্যাপার।

এখন আর সিগারেট খাবার কোনো উপায় নেই জেনে সামান্য অস্বস্তি হলো, শরীরটার মধ্যেও খানিকটা চিনচিন করছে, কাছে সিগারেট না থাকলে সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছেটাই কি সাংঘাতিক প্রবল হয়, বস্তুত হীরেন শরীরে এক ধরনের অবসাদে বোধ করতে থাকে, ললিতার চুলের গুচ্ছে হেমকান্তির একটা হাত মুঠো করা—হেমকান্তি মুখখানা আস্তে আস্তে এগিয়ে আনছে—এই দৃশ্যটাই শুধু তার চোখে ভাসছে। হীরেন লক্ষ্য করলো, ওর কপালের কাছে ও নাকের ডগাটা একটু গরম গরম লাগছে, অর্থাৎ ও উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। অথচ ব্যাপারটা এমন কিছু নয়, হীরেন ভাবলো ; কিছুই এতে আসে যায় না, সামান্য একটু চুমু, সে নিজেও কি আগে একাধিক মেয়েকে চুমু খায় নি ? সে কি তাদের জন্য বিরলে দুঃখ বোধ করে ? মোটেই না—তারা কোথায় হারিয়ে গেছে, বিশেষ বিশেষ সেই সব চুমু খাবার মুহূর্তে খানিকটা আকর্ষণ বোধ করেছিল—এই পর্যন্ত। একমাত্র অরুণা, মাঝে মাঝে অরুণার ব্যাপারটা একটু খট্‌কা লাগে, কিন্তু সে ঘটনাই তো অন্য রকম। অরুণাকে তার মাঝে মাঝে মনে পড়ে, মনে পড়লেই একটু খারাপ লাগে। কিন্তু অরুণা তাকে ভুলে গেছে নিশ্চয়ই, ভুলে যাওয়াই ভালো। ললিতাও হেমকান্তিকে ভুলে যাবে—এবার হেমকান্তির জন্য একটা ভালো পাত্রী দেখে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে দেখছি !

লাল ডাকবাক্সটার গায় এমন একটা মরচে ধরা তালা লাগানো যে দেখলে সন্দেহ হয়—কোনোদিন এটা খোলা হয় কি না ! হীরেন একটু ইতস্তত করলো। এ সব মফস্বল শহরের ডাক ব্যবস্থায় ঠিক বিশ্বাস নেই, সে মিষ্টির দোকানদারকে জিজ্ঞেস করতে গেল। দোকানে কাঠের বেঞ্চিতে চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে কয়েকজন যুবক আড্ডা দিচ্ছে ; চায়ের দোকানে আড্ডা মারার স্বভাব কলকাতা

থেকে পুরুলিয়ার মতন শহরেও পেঁছে গেছে। হীরেনের খুবই লোভ হলো ঐ দোকানে বসে একটু চা খায়, আরও খানিকটা সময় কাটিয়ে ফিরতে চায়, কিন্তু উপায় নেই, পকেটে একটা পয়সা পর্যন্ত নেই। সিগারেটের তৃষ্ণাও তাকে আকুল করে তোলে। এখানে একা বসে চায়ের সঙ্গে সিগারেট খেতে পারলে তার মুখখানা স্বাভাবিক হয়ে আসতে পারতো. তখন সে ওদের দু'জনের মনে সামান্যতম সন্দেহ না জাগিয়ে বাড়ি ফিরতে পারতো।

স্বাভাবিক তাকে হতেই হবে, হীরেন খুব মনের জোর দিয়ে কথাটা ভাবলো, একটা চুমুর জন্য কিছু আসে যায় না। হেমকান্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব সে নষ্ট করতে পারবে না। আর, ললিতার ভালোবাসা হারালে পৃথিবীতে সে আর কোথায় আশ্রয় পাবে? হীরেন তখন একটু আগে দেখা সেই দৃশ্য ও ওদের দু'জনের যা সামান্য কথা সে শুনতে পেয়েছে তাই মনে করার চেষ্টা করলো।

হীরেন যখন দরজার কাছাকাছি এসেছিল, তখন ললিতার কাঁধে হেমকান্তির হাত। তা দেখে হীরেনের একটুও খটকা লাগে নি, এমন কি একথাও ভাবে নি, মাত্র সাড়ে তিনমিনিট আগে ওরা দু'জন ছিল উঠোনে ও রান্নাঘরে, এরই মধ্যে দুজনে দু'জনের কাজ ফেলে ঘরের মধ্যে চলে এলো কি করে? তবে কি আগে থেকেই ওদের ঠিক করা ছিল, হীরেন বেরিয়ে যাবার পরই চোখাচোখিতে কথা ঠিক হয়ে যায়? হীরেন তখনও এ কথা ভাবে নি, ভেবেছিল পরে, তার আগে সে অন্যমনস্কভাবে দরজা পেরিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় শুনতে পেলো, কি করছেন। কি? আপনি পাগল! এক্ষুনি ও এসে পড়বে!—আর, তারপরই হেমকান্তির ব্যাকুল মিনতিপূর্ণ গলা, না আসবে না, একবার, একবার! হীরেন তখনি দাঁড়িয়ে পড়েছিল, যেন নিজের স্ত্রী ভেবে নয়, কোথাও কোনো যুবতীকে কোনো যুবক চুমু খাচ্ছে—এই দৃশ্য দেখে ফেললে যেমন আড়াল থেকে আরও দেখতে ইচ্ছে হয়—অনেকটা সেই রকম। ললিতা বলেছিল, না, একবারও না, ছিঃ!

হেমকান্তি বলেছিল, এসো, একবার, শুধু একবার!

—না! না!

—হ্যাঁ! এসো!

—না! কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন!

—আমি কত কষ্ট পাচ্ছি, তুমি জানো না!

এরপর হেমকান্তি একহাত ললিতার কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছে ডুবিয়ে অন্য হাতে ললিতার চিবুক ধরে, এবং ললিতার সকালবেলার ফোলা ঠোঁটে প্রগাঢ় চুম্বন করে। একবার মাত্র। চুম্বনের পর দু'জনই কয়েক সেকেণ্ড একেবারে নিঃশব্দ। তারপর, ললিতা খানিকটা কাতর গলায় বলেছে, কেন এ রকম করলেন?

হেমকান্তি চাপা গলায় স্বীকার করে, আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু আমি আর পারছিলাম না, তুমি এত সুন্দর—

—ও কথা আর বলবেন না।

—ওকথা বারবার বলবো। কিন্তু এইমাত্র যা করলুম, তার জন্য আমার অনুতাপ হচ্ছে, হীরেনকে আমি দুঃখ দিতে চাই না।

—সত্যি এ রকম আর কখনো করবেন না বলুন? ও আপনার কতদিনের বন্ধু।

—আমার ওপর রাগ করো না, আমাকে ক্ষমা করো, আর কখনো না।

এই সময় হীরেন চলে এসেছিল।

চিঠি ফেলার পর হীরেন স্টেশনের দিকে বেড়াতে যায়। মাত্র একটা ট্রেন ছেড়ে গেল। এই ট্রেনে খবরেব কাগজ এসেছে, কিন্তু তার তো কাগজ কেনারও উপায় নেই। সে উ'কি মেবে প্রথম পাতাব খবরগুলো দেখে নেবার চেষ্টা করে। চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ ও সিগারেট খাওয়া—কলকাতার এই বাঁধা অভ্যেস আজ কিছুতেই রাখা যাচ্ছে না। কিন্তু এখানকার রোদ্দুরটা এত ভালো, কলকাতার সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না, বেশ গাঢ় ধরনের শীতের সকালে এমন সাদা রোদ্দুর, সারা শরীরটাকে বেশ মোলায়েম করে তুলেছে। এই রোদ্দুরে বুড়ি ভিখারীর মুখও সুন্দর মনে হয়।

স্টেশনের বাইরে পুরানো ডাকবাংলো, সাহেব-মেম বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে রোদ্দুরে আরাম করছে। ওদিকে বোকারোর কাজ শুরু হয়েছে বলে, এ পথ দিয়ে আবার অনেক খাঁটি সাহেব-মেমের যাতায়াত শুরু হয়েছে। টুকেটুকে লালরঙের সোয়েটার পরা দুটি ফুটফুটে বাচ্চা বল নিয়ে খেলা করছে মাঠের মধ্যে, একটি অষ্টাদশী মেম-তরুণী কি-যেন খেলার নিয়ম বোঝাচ্ছে ওদের। নীল-রঙা গাউন, মাথায় হলদে স্কার্ফ বাঁধা, কি স্বচ্ছন্দ স্বাস্থ্য মেয়েটির, মসৃণ চামড়া, ঝকঝকে সাদা দাঁত, নরম রক্তিম ঠোঁট। হীরেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ খেলা দেখতে লাগলো। ওদের তো ওসবে কিছুই আসে যায় না। অনেক সময় স্বামীর সামনেও বউকে চুমু খেলে সেটা হয় টাট্টা। কি যেন একটা রুমাল-চোর ধরনের খেলা আছে ওদের? যে জিতবে, সেই পাশের মেয়েটিকে একবার চুমু খাবে—

দরজা খোলা ছিল কেন? ওরা দরজাটা বন্ধ করে নিলেই পারতো। কিন্তু সকালবেলা ঘরের দরজা বন্ধ করা দৃষ্টিকটু। সাড়ে তিন কি চার মিনিটেই ওরা ব্যাপারটা ঠিক করে ফেললো কি করে? আসলে যা মনে হয়, ওরা কিছুই আগে ঠিক করে নি, রান্নাঘরের বারান্দায় ছিল ললিতা, উঠোনে বসে হেমকান্তি দাড়ি কামাতে কামাতে দু'একটা ফষ্টিনষ্টি করছিল। কিছু একটা দরকারে ললিতা এসেছিল ঘরের মধ্যে, সেই সময় হেমকান্তিও টপ্ করে উঠে এসে ঝোঁকের মাথায় ওকে জড়িয়ে ধরে। একটা অন্ধ আবেগের ব্যাপার। ছবিটা ভেবে নিয়ে নিজের যুক্তিবাদী কল্পনা শক্তিতে হীরেন বেশ খুশী হয়ে ওঠে। অন্ধ আবেগের ব্যাপার, হঠাৎ করে ফেলে—দু'জনেই এখন অনুতপ্ত, তা তো ওদের কথা শুনেই বোঝা

গেল। ললিতা তো রাজী হয়ইনি, হেমকান্তিটা বরাবরই একগুঁয়ে, যখন যা মনে হয় না করে ছাড়ে না, কিন্তু পরে অনুতাপ করে।

হেমকান্তির অন্যায় আবদারে ললিতা যে চেঁচিয়ে ওঠে নি, কান্নাকাটি করে নাটক বাধায় নি, এতে ললিতার প্রতি হীরেনের কৃতজ্ঞতাই বোধ হয়, নাটকীয় ব্যাপার সে একেবারেই পছন্দ করে না।···ওদের যে-কটা কথা শুনেছে, তাতে হীরেন স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে যে, ললিতা আগাগোড়াই হেমকান্তিকে বাধা দিয়েছে, হেমকান্তির ছেলেমানুষী দৌরাত্ম্যর কাছে একবারের মত আত্মসমর্পণ করলেও মন থেকে সায় দেয় নি কিছুতেই। ললিতার কথার সুরে একথাও ফুটে উঠেছে যে, হেমকান্তির অন্যায় আবদারের জন্য—হীরেনকে বলে দিয়ে সে কোনো শাস্তি আদায় করতেও পারবে না।

হেমকান্তি হীরেনের প্রায় জন্ম থেকে বন্ধু, গোটা ইস্কুল আর কলেজ জীবন একসঙ্গে কাটিয়েছে, হীরেনের বিয়ের সাতপাকের সময় হেমকান্তি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল পর্যন্ত। সেই হেমকান্তির সঙ্গে হীরেনের বিচ্ছেদ কল্পনাও করা যায় না, ললিতাও তা জানে। তার বদলে, সামান্য একবার—।

'কেন আমায় কষ্ট দিচ্ছেন ?' ললিতা একথা বলেছিল কেন ? 'হীরেন আবার একটু হাসলো। পরপুরুষের মুখে রূপের স্তুতি শুনে একটু অন্তত বিচলিত বোধ করবে না—এমন মেয়ে আবার হয় না কি ? ওটা তো স্বাভাবিক, যেমন স্বাভাবিক যত প্রিয় বন্ধুই হোক, তার সুন্দরী স্ত্রীকে আড়ালে পেলে যে কোনো পুরুষের পক্ষেই একটু ফষ্টিনষ্টি করার লোভ জাগে। দু'জনের মধ্যে কেউ যদি একটু বদ হতো, তা হলেই ব্যাপারটা অনেক দূরে গড়াতো। কিন্তু হীরেন হেমকান্তিকে জানে ওর চরিত্রে হঠকারিতা থাকলেও মলিনতা নেই এক ছিটে। আর—ললিতা, সাড়ে চার বছর বিয়ে হয়ে গেছে, তবু হীরেন জানে—ললিতাকে ছাড়া তার জীবনটা শূন্য হয়ে যাবে, ললিতা ছাড়া তার আর কোনো অবলম্বন নেই। স্ত্রীর কাছ থেকে শুধু ভালোবাসা পাওয়াই যথেষ্ট নয়, ললিতার স্বভাবের মধ্যে একটা গভীর সমবেদনা আছে।

ললিতার প্রথম কথাটাতেও একটু খট্‌কা লাগতে পারে। 'কি করেছেন কি ? এক্ষুনি ও এসে পড়বে !' হীরেনের এসে পড়াতেই একমাত্র আপত্তি। একমাত্র না হোক, হীরেন ভাবলো সত্যিই তো এইটাই প্রধান। দেখে ফেলাটাই তো সবচেয়ে ভয়ংকর ! অন্য কেউ দেখে না ফেললে, আর সব কিছু মিটিয়ে ফেলা যায়, ভুলে যাওয়া, দূরে যেতে পাওয়া যায়, কিন্তু একবার কেউ দেখলেই তা শাশ্বত হয়ে গেল ! ভাগ্যিস, হীরেন যে দেখে ফেলেছে, তা ওরা দেখে নি !

অজান্তেই হীরেন মনে মনে হিসেব করে, সাত না আট ? আটজন—এ পর্যন্ত ললিতা ছাড়া আরও আটটি মেয়েকে চুমু খেয়েছে হীরেন, সেজো মামীমাকে ধরেই, বিয়ের পরই তো দুজনকে, একবারও কেউ দেখে নি, কেউ সন্দেহও করে নি, তাই কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই ! দীপ্তির সঙ্গে এখনো

দেখা হয়, ললিতার সঙ্গে একদিন সিনেমা দেখতে গিয়েও তো দীপ্তির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কত স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা হলো, মুখের একটি রেখাও বদলায়নি। কল্যাণী বিয়ের পর বোম্বাইতে আছে, তিনটি ছেলেমেয়ে হয়েছে না কি। নীলি, মানে নীলিমা—হীরেনের পিসতুতো বোন, তাকে তো চুমু ছাড়াও আরও কত কি সে তো এক আই এ এস-কে বিয়ে করে এখন খুব সমাজসেবিকা হয়েছে—সুবাদে সেজোমামীমা এখনো নিরালায় দেখলেই চোখের ইঙ্গিত জানায়—এসব তো আর কেউ দেখেনি, তাই কোথাও অশান্তি নেই। দেখাটাই তো একমাত্র দোষের, তাছাড়া কোথায় কি ঘটছে—কে জানে! ওদের কারুর জন্য হীরেনের পিছুটানও নেই, শুধু, একমাত্র অরুণা, অরুণার কথা ভাবলেই হীরেনের বুক শিরশির করে—। না. অরুণাকে চুমু খাবার সময়েও কেউ দেখে নি, কিন্তু, একমাত্র অরুণাকেই ও চুমু খেয়েছিল জোর করে।

তখন হীরেনেরা থাকতো কোন্নগরে. ওদের পাশের বাড়ির পরিবারটা ছিল ছন্নছাড়া। অরুণার বাবা গগনবাবু ছিলেন রেসের বুকি, লোকের কাছ থেকে পাঁচ আনা-দশ আনা পয়সা নিয়ে রেসের বাজি ধরতেন, প্রত্যেক শনিবার ওদের বাড়ির সামনে চেঁচামেচি হৈ-হল্লা লেগেই থাকতো। গগনবাবুকে দেখলেই মনে হতো লোকটা ভালো নয়, মানুষ ঠকানোই ওঁর কাজ, তা ছাড়া, স্টেশনের পাশে রিক্‌শাওলাদের সঙ্গে বসে গগনবাবুকে দিশি মদ খেতে হীরেন নিজের চোখে দেখেছে। অরুণার দাদা সাধনটা তো ছিল এক নম্বরের গুণ্ডা, শুধু পাড়ায় বখামিই নয়, রাত্তিরবেলা ছিনতাই, জোচ্চুরির কাজেও ওস্তাদ ছিল, দু-তিনবার পুলিশেও ধরা পড়েছিল, পাড়ার এক রাজনৈতিক নেতা বারবার ওকে ছাড়িয়ে এনেছে। অরুণার ছোট ভাইবোনরা বস্তির ছেলেদের সঙ্গে মিশে রাস্তায় ছিপি খেলতো, কি কুৎসিত গালাগালি শিখেছিল দশ-বারো বছরেই—অরুণার মা বালিশের ওয়াড় আর ফ্রক-পায়জামা সেলাই করে বিক্রি করতেন। সেই বাড়ির মেয়ে অরুণা, অরুণা কলেজে পড়তো। অসম্ভব তেজ ছিল তার। পাড়ার কারুর সঙ্গে, বাড়ির কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলতো না, নিরেট মুখ করে সোজা হয়ে হেঁটে যেতো রাস্তা দিয়ে। পাড়ার ছেলেরা, অনেক সময় সাধনের বন্ধুরাও অরুণাকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল মন্তব্য করেছে, সিটি দিয়েছে, অরুণা কোনোদিন ঘাড় তুলে তাকায় নি। সন্ধেবেলা দুটো টিউশানি করতো, তাই দিয়ে পড়ার খরচ চালিয়েছে। হীরেন চেয়েছিল অরুণার কাছাকাছি আসতে। গোড়ার দিকে অরুণাকে শ্রদ্ধা করতো সে, ক্রমে এক ধরনের মায়া ও শারীরিক আকর্ষণ জাগে। বছর সাতেক আগের কথা, হীরেন তখন সদ্য পোর্ট কমিশনার্স অফিসে চাকরি পেয়েছে, হীরেন চেয়েছিল অরুণাকে বিয়ে করে তাকে ঐ পরিবেশ থেকে উদ্ধার করবে।

কিন্তু অরুণা হীরেনকে গ্রাহ্য করে নি, কিছু যেন একটা ব্রত ছিল তার। অরুণা একমাত্র কিছুটা কথাবার্তা বলতো হীরেনের দিদির সঙ্গে, হীরেনের দিদি

তখন উইমেন্স কলেজে পড়ান, অরুণা মাঝে মাঝে দিদির কাছে আসতো পড়াশুনো দেখে নিতে। হীরেন চেষ্টা করেছিল অরুণার সঙ্গে ভাব করতে. অরুণা ঠাণ্ডা গলায় কাটাকাটা উত্তর দিয়েছে শুধু. অরুণার চোখ দুটো অসম্ভব জ্বলজ্বলে, সব সময় চোয়াল শক্ত, ভেতরে ভেতরে যেন সর্বক্ষণ একটা তীব্র ক্রোধ জ্বলছে। হীরেন একদিন বলেছিল, বাগবাজারে একটা মেয়েদের স্কুলে একটা চাকরি খালি আছে—আমার এক বন্ধু বলছিল, তুমি করবে নাকি? আমার বন্ধুর কাকা সেই স্কুলের সেক্রেটারী -। অরুণা শুধু সংক্ষেপে জানিয়েছিল আমি কারুর চেনাশুনোর জোরে কোনো চাকরি নিতে চাই না!

হেমকান্তির মতন হীরেন অমন হঠকারী নয়, কিন্তু অরুণার ব্যাপারে হীরেন কিছুদিনের জন্য ক্ষেপে উঠেছিল। সে যে সৎ এবং ভালো উদ্দেশ্যেই অরুণার সঙ্গে মিশতে চায়—অরুণা এটুকুও বুঝতে চায়নি বলেই যেন হীরেন ক্রমশ বেশী ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। একদিন দিদির ঘরে অরুণাকে একা পেয়ে, দিদি তখন নিচে বাথরুমে গেছে, হীরেন অকস্মাৎ এসে অরুণার হাত ধরে আবেগবিহ্বল গলায় বলেছিল অরুণা, শোনো—। অরুণা এক ঝটকায় সরে গিয়ে তিক্ত গলায় বলেছিল হাত ধরছেন কেন? হীরেন তখুনি কাঁচুমাচুভাবে বলেছিল, অরুণা. তুমি আমাকে ভুল বুঝ না. আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই।—অরুণা ওর দিকে না তাকিয়েই বলে, আমি কারুর বন্ধুত্ব চাই না। হীরেন আহতভাবে জিজ্ঞেস করলো, কেন? সত্যি, বিশ্বাস করো! অরুণা অস্থির হয়ে জ্বলে ওঠে, আপনি কি চান, আমি এখান থেকে চলে যাই?

আরও দু'তিনটি কথা বলার পর অরুণার তিক্ততা আরও বাড়তে দেখে হীরেন উন্মত্তের মতন হয়ে যায়, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে অরুণাকে জড়িয়ে ধরেছিল. অরুণা সমগ্র শক্তিতে বাধা দিয়ে হীরেনের চুল ধরে টানতে থাকে, এক হাতে সরিয়ে দিতে চায় হীরেনের মুখ, তবু হীরেন জোর করে অরুণার ঠোঁট কামড়ে ধরে. একহাত নেমে আসে অরুণার বুকের কাছে, তখনও কাতরভাবে বলতে থাকে, অরুণা আমায় বিশ্বাস করো—কোনোক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অরুণা বলে, আপনারা সবাই আমার সঙ্গে শত্রুতা করবেন? আপনারা সবাই—অরুণা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে এবং তখুনি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সে ঘটনাও কেউ দেখে নি দিদি জানতে পাবে নি, কেউই জানে নি, কিন্তু অরুণা আর কখনো ওদের বাড়িতে আসে নি এবং মাসখানেকের মধ্যেই বাঁকুড়া না কোথায় ইস্কুলের কাজ নিয়ে চলে যায়। যাবার আগে অরুণা ওর বাড়ির লোকের সঙ্গে বিষম ঝগড়া করেছিল।

রোদের তাপ বেশ চড়া হতে হীরেনের খেয়াল হয় অনেকক্ষণ আগেই তার ফেরা উচিত ছিল. এতক্ষণ না ফেরা আবার তার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এবং ডাকবাংলোর কাছ থেকে সরে এসে কখন যে সে চৌরাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে—তাও খেয়াল করে নি। একটু দ্রুত বাড়ি ফেরার পথ ধরতেই কিছুটা দূরে গিয়ে

মিউনিসিপ্যালিটির সামনে হেমকান্তির সঙ্গে তার দেখা হয়। হেমকান্তির ম্লান করা চেহারা, পুরোদস্তুর স্যুট-টাই ও পালিশ-করা জুতো। হেমকান্তি এখানকার আদালতের হাকিম। হীরেনকে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো, কিরে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি? হীরেন আলগাভাবে বললো, ঘুরে-ফিরে শহরটা দেখছিলাম—ছোট হলেও মন্দ না শহরটা, বেশ ছিমছাম।

—তোকে সিগারেট কিনতে বলেছিলুম, ললিতা বললো তুই পয়সা নিয়ে বেরোস নি!

হীরেন সহাস্য উত্তর দিল, এই পর্যন্ত এসে পকেটে হাত দিয়ে দেখি যে খালি! দে, সিগারেট দে!

হেমকান্তির কাছ থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে হীরেন জিজ্ঞেস করলো, তোর ছুটি পাওনা নেই?

—আজ সোমবার তো, আজ অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে তারপর টানা চারদিন ছুটি নিয়ে নেবো। কাল অযোধ্যা পাহাড় যাবি?

—সেটা কতদূরে? পুরুলিয়ায় আবার পাহাড় আছে নাকি?

—পাহাড় মানে টিবি আর কি। বেশী দূরে না, তবে জায়গাটা সুন্দর, একটা চমৎকার বাংলো আছে। দেখি লাহিড়ীকে বলে একটা স্টেশন ওয়াগন যোগাড় করতে পারি কি না। না হলে, কোনো ট্যাক্সির সঙ্গে কথা বলে রাখবো—

—তুই খেয়েছিস?

—না, ললিতা মাংস চাপিয়েছে। দুপুরে এসে খাবে, এখন।

হেমকান্তির হন্‌হন্‌ করে হেঁটে যাওয়া চেহারার দিকে হীরেন খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। পাতলার ওপর চেহারা, হেমকে দেখলে এখনো তিরিশের নিচে বয়েস মনে হয়।

বারান্দাতেই তোলা উনুন এনে ললিতা মাংস চাপিয়েছে। এর মধ্যে স্নান সারা হয়ে গেছে তার, একরাশ কোঁকড়া চুল পিঠময় ছড়ানো। রোদ্দুরে এখন আর অমন ধপধপে সাদা নেই, এখন একটু হলদেটে, তবু এই নরম রোদ্দুরে ললিতার সুন্দর মুখ আরও সুন্দর মনে হয়। উনুনের আঁচে খানিকটা লালচে হয়ে পড়েছে।

হীরেনের দিকে চোখ তুলে ললিতা জিজ্ঞেস করে, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

হীরেন বললো, ঘুরে ফিরে দেখে এলাম। এখানে বেতের জিনিস বেশ সস্তা। ভাবছি যাবার সময় এখান থেকে কয়েকটা বেতের চেয়ার নিয়ে যাবো।

—হ্যাঁ! এ্যাদ্দুর থেকে আর বেতের চেয়ার নিতে হবে না। তা ছাড়া বেতের চেয়ার বেশী দিন টেকে নাকি?

—বরং কয়েকটা বেড কভার নিয়ে যাবো। ঠাকুরপো বললো, এখানকার বেড কভার নাকি ভালো?

কথা বলতে বলতে হীরেন এসে রান্নাঘরের বারান্দাতেই বসে পড়ে। বাথ্যা[illegible] এক কোণে বসে শিল-নোড়ায় পেঁয়াজ বাটছে আর গামছা দিয়ে চোখের জল মুছছে। বড় সাইজের দু'তিনটে দাঁড়কাক কি জন্য চিৎকার করছে কে জানে? হীরেন জিজ্ঞেস করলো, তোমার রান্নার কত দেরি?

ললিতা মুখ টিপে হেসে বললো, তোমার এর মধ্যেই খিদে পেয়েছে নাকি?

—তা মন্দ পায় নি! এখানকার জলে বেশ খিদে হয়।

—কলকাতার জলেও তো তোমার খিদে কম দেখি না।

—তা বলে তুমি মোটেই আমাকে পেটুক বলতে পারো না। কতক্ষণ চাপিয়েছো, দাও একটু চেখে দেখি।

—বেশীক্ষণ চাপে নি, এখনো কাঁচা। তুমি বরং ততক্ষণ স্নান করে নাও না। আর একটা উনুনে ভাত বসিয়ে দিয়েছি।

—দাঁড়াও, এখুনি কি চান করবো? খবরের কাগজ দেয় নি, না?

—উঁহু।

—হেমটা বোধ হয় কাগজের পয়সা বাঁচায়। কোর্টে গিয়ে কাগজ পড়ে।

—তোমার বন্ধু বোধহয় একটু কৃপণ আছে, না?

—কৃপণ? হেম? মোটেই না—

—চারজন খাবো দু'বেলা, মোটে একটা মুরগী আনতে দিয়েছে কেন? তুমি কিন্তু কাল সকালে নিজে বাজার করবে? সবকটা দিন বন্ধুর ঘাড়ে চালিও না।

—হেম মোটেই কৃপণ নয়। ও খাওয়া-টাওয়া বেশী পছন্দ করে না, কিন্তু অন্য অনেকরকম শৌখিনতা আছে। দেখছো না, ঘরে কত রকম স্নো-পাউডার সেণ্টের শিশি! ব্যাচেলার মানুষ, বেশ আছে!

—তোমার বুঝি লোভ হচ্ছে? তুমি খুব খারাপ আছো, না?

—আমার মতন ওর তো কোনো বন্ধন নেই!

—আমি তোমার বন্ধন?

—বন্ধনই তো—

এ কথা বলে হাসতে হাসতে অভ্যাস বশে হীরেন ললিতার দিকে হাত বাড়ায়। ললিতা ত্রস্তে সরে গিয়ে চাকরকে ইশারায় দেখিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বলে, কি হচ্ছে কি? যত দিন যাচ্ছে তত তোমার লোভ বাড়ছে।

কথা শেষ করে ললিতাও ছোট্ট করে মধুরভাবে হাসে। দাঁড়িয়ে উঠে হীরেন বলে, ভাগ্যিস ও বেচারা একবর্ণ বাংলা বোঝে না।

বারান্দা থেকে নেমে উঠোনে এসে হীরেন আবার একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ভারী মনোরম এই ছুটি, এই সকাল, দূরে ট্রেনের হুইশ্‌ল বেজে উঠলো, বাইরে একটা ছাগলের বাচ্চা তখন থেকে একটানা ডাকছে—কোথাও কোনো গরমিল নেই। হঠাৎ হীরেনের মনে হলো, সকালে ঐ দৃশ্যটা ও কি সত্যিই দেখেছিল, নাকি তার দিবাস্বপ্ন? রাস্তায় দেখা হলো হেমকান্তির সঙ্গে, ঐ তো ললিতা

বসে পিঠে চুল মেলে, কোথাও কোনো আড়ষ্টতা নেই, জড়তা নেই, সবই স্বচ্ছন্দ, সারা পৃথিবী কি তার সঙ্গে অভিনয় করে যাচ্ছে নাকি আজ সকালে? নাঃ, ও রকম কিছু সত্যিই ঘটে নি, সবটাই হীরেনের কল্পনা। দিবাস্বপ্নকে কে গুরুত্ব দেয়?

আস্তে আস্তে হীরেন এসে হেমকান্তির ঘরে ঢুকলো। খুব সন্তর্পণে দরজাটা তখন যেমন ছিল, সেইরকম আধখোলা রাখলো। বন্ধ জানলাটার কাছে আলমারি, এখানে ললিতা দাঁড়িয়েছিল, আলমারির দুটো পাল্লাজোড়া আয়না, আয়নায় ছায়া পড়ছিল। হয়তো আলমারি থেকে মাখনের টিন নিতেই ললিতা তখন ঘরে ঢুকেছিল। ঐখানে দাঁড়িয়েছিল হেমকান্তি. হীরেন নিজে এসে ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়ালো না, এখান থেকে দরজা দেখা যায় না। হীরেন ফিসফিস করে বললো, একবার! একবার!—একথা কি বাইরে থেকে শোনা যায়? শুনতে পাবারই তো কথা!

হঠাৎ হীরেনের মনে হলো, হেমকান্তি আর ললিতা যেন দু'জনেই তাকে উকিল হিসেবে নিয়োগ করেছে, সে যেন প্রাণপণে ওদের দু'জনের পক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করছে। আর ওদিকে আদালতে বসে হেমকান্তি এতক্ষণে অন্য লোকদের শাস্তি দিচ্ছে।

এই সময় ললিতা এসে ঘরে ঢুকলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখটা হাল্কা করে হীরেন বললো, তোমায় আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, লতু!

ললিতা ওর কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে, বুকে শরীরটা হেলান দিয়ে একটু আদুরে গলায় বলে, মাঝে মাঝে বাইরে বেড়াতে এলে. বেশ হয়, না? এবার থেকে আমরা বছরে একবার করে আসবো—

—খরচ কম নয়—

এমন কিছু খরচ নয়। সারা বছর চেষ্টা করলে ঠিকই হয়।

হীরেন দু'হাত দিয়ে ললিতাকে বেষ্টন করে। ললিতার বুকের ওপর ওর হাতের চাপ পড়লেও ললিতা বিশেষ আপত্তি করে না, শুধু বলে, চাকরটা যদি এদিকে আসে আবার—

হীরেন নিজের মুখটা ললিতার কাছে এগিয়ে এনেও ভাবে, আচ্ছা, এখন থাক, অন্তত একটা দিন থাক্ না—। সে তার গালটা রাখে ললিতার গালে, আঃ কি ঠাণ্ডা, কি শান্তি, গরীবের ঘরের বৌ হয়েও ললিতা স্বাস্থ্যটা ভালো রেখেছে। গালে গাল রেখেই হীরেন ললিতার শরীরটা দোলাতে থাকে, এবং ইয়ার্কি করার মতন লঘু গলায় বলে, হেম আবার তোমার সঙ্গে প্রেম-টেম করার চেষ্টা করে নি তো?

ললিতা বললো, কেন, ভয় আছে নাকি তোমার? আমার মাথা ঘুরে যেতে পারে?

হীরেন বললো, তা নয়, হেমটা আবার একটু কবি-কবি স্বভাবের আছে। ও

যদি কখনো একটু বেশী গদ্গদ হয়ে ওঠে, তুমি আবার সেটা খুব সীরিয়াসলি নিও না !

কলহাস্য করে উঠে ললিতা বলে, বত্রিশ বছর বয়েস হয়ে গেল, এখন আর এ চেহারা দেখে কারুর কবিত্ব জাগবে না—তোমার ছাড়া !

গাল সরিয়ে এনে উদাসীনভাবে হীরেন বলে, বাথরুমে জল দিয়েছো ?

—হ্যাঁ জল আছে। আমি দেখি, মাংসটা ধরে গেল নাকি ! ছাড়ো—

হেমকান্তির বাথরুমও খুব শৌখিনভাবে সাজানো। সিঙ্ক, বেসিনগুলো পরিষ্কার, ঝকঝকে। এরকম মফস্বল শহরের বাড়িতেও এরকম আধুনিক কায়দার বাথরুম আশা করা যায় না। তাকে সারি সারি সাজানো সাবান, শেভিং ক্রিম, পেস্ট শ্যাম্পু। র‍্যাকে দু'তিনটে তোয়ালে। হীরেন নিজের তোয়ালে নিয়ে এসেছিল, একটু বাদে ও খেয়াল করলো, তোয়ালে কাঁধে নিয়ে ও বাথরুমের মধ্যে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কেন দাঁড়িয়ে আছে, নিজেই প্রশ্ন করলো। পরক্ষণেই বুঝতে পারলো, এরকমভাবে তো সে কোনো দিনই স্নান করে না। একে শীতকাল, তার ওপর কুয়ো থেকে তোলা কনকনে ঠাণ্ডা জল. এরকম জলে হীরেন কখনো স্নান করতে পারে না। তার বিষম ঠাণ্ডার ধাত. বারো মাস সে গরম জলে স্নান করে, শীতকালে তো কথাই নেই। সে পুকুরে কিংবা নদীতে পর্যন্ত সাঁতার দিয়ে স্নান করতে পারে না।

ললিতা আজ তাকে গরম জল দিতে ভুলে গেছে। কালও গরম জলে স্নান করার ব্যাপারে হেমকান্তি তাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গরম জল না করিয়ে হীরেন কিছুতেই স্নান করেনি। আজ, ললিতার গরম জলের কথা মনেই পড়ে নি। হীরেন একবার ভাবলো চেঁচিয়ে ললিতাকে গরম জলের কথা বলে, কিন্তু মনে পড়লো, দুটো উনুনেই রান্না চাপানো—এখন জল গরম করা অনেক ঝঞ্ঝাট ! যেন ললিতার সঙ্গে ঠাট্টা করার লোভেই হীরেন আজ বহুকাল বাদে ঠাণ্ডা জলেই স্নান করবে ঠিক করে ফেললো। ব্রাসে পেস্ট নিয়ে মুখ ঘষতে লাগলো সে।

সেই দারুণ ঠাণ্ডা জল বালতির পর বালতি মাথায় ঢেলে অল্পক্ষণে স্নান সেরে ফেলে হীরেন, সমস্ত শরীরটা যেন অবশ হয়ে গেছে, দাঁত ঠক্‌ঠক্‌ করছে তার। তাড়াতাড়ি গা মুছে দরজার সামনে আসে, পা-টা তখনও ভিজে বলে তোয়ালে দিয়ে পা মুছতে থাকে বারবার। তারপর, বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দরজা না খুলে আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায় একটু। বাথরুমের মধ্যে এইমাত্র কি যেন একটা ঘটে গেল ! কি ঘটলো ? হীরেন ভাববার চেষ্টা করে এবং একটু বাদেই সেটা বুঝতে পেরে অপরাধীর মতন লাজুকভাবে হাসে। হেমকান্তির ওপর সত্যিই তার রাগ হয়েছে তা হলে। কেননা, হীরেন বুঝতে পারলো, অন্যমনস্কভাবে সে হেমকান্তির পেস্ট থেকে দাঁত মাজতে গিয়ে, টিউবের প্রায় অর্ধেকটা টিপে অনেকখানি পেস্ট মাটিতে ফেলে নষ্ট করেছে। হেমকান্তির

হীরেন একটুক্ষণ চুপ করে থাকে ।। তারপর কি ভেবে আবার ছটফট করে উঠে বলে,—লতু! লতু! আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আর পারছি না, যদি মরে যাই—

—ওকি অলুক্ষুণে কথা! চুপ! না-না-কিছু হয় নি তোমার—

ললিতা প্রায় হাহাকার করে। জোর করে একহাতে হীরেনের মুখ চাপা দেয়। অন্য এক হাতে হীরেনের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। হীরেন একটু শান্ত হয়ে মুখ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, আঃ, এখন আরাম লাগছে। আগে হাত বুলিয়ে দাওনি কেন?

—দিচ্ছি তো, অনেকক্ষণ থেকে। এখন কম লাগছে?

—অনেক কম লাগছে। হঠাৎ আমার এমন অসুখ হলো কেন বলো তো?

—কি জানি!

হীরেন একটা অনেক বড় দীর্ঘশ্বাস ফেললো। হঠাৎ ওর চোখটা ভিজে এলো। পাশ ফিরে ললিতার জানু দুটো চেপে ধরে বললো,—না, মরবো কেন? এমনি বলছিলাম, যদি হঠাৎ মরে যাই।

—আবার ঐ কথা? তুমি চুপ করে ঘুমোও বলছি।

—লতু, তোমায় আমি কতটা যে সত্যি ভালোবাসি, তুমি জানো?

—জানি।

—তোমায় যদি একটা কথা বলি, তাহলে তুমি আমাকে ভালোবাসবে?

—কি কথা?

—লতু, কথা দাও আগে, সে কথা শুনেও আমায় তুমি ভালোবাসবে?

ললিতা সমস্ত শরীর নিয়ে হীরেনের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে। ভয় পাওয়া গলায় বলে, ওকি, তুমি ওরকম করছো কেন? তোমার ঠোঁট কাঁপছে। আজ আর কিছু বলতে হবে না—কাল বলো—

—না, কথা দাও, সে কথা শুনেও—

—কথা দিচ্ছি। তুমি তো জানোই, তোমায় আমি চিরদিনই ভালোবাসবো।

—না, আজ সকাল থেকে একটা কথা মনে পড়ে এমন মন খারাপ লাগছে। আমি একবার খুব অন্যায় করেছিলুম, ওঃ! জানো লতু, অরুণা বলে একটা মেয়েকে আমি একবার জোর করে চুমু খেয়েছিলাম। তার একটুও ইচ্ছে ছিল না, সে আমায় পছন্দ করতো না, তবু আমি গায়ের জোরে, জন্তুর মতন, ওঃ, আমার জন্যই মেয়েটা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। একথা শুনেও তুমি আমাকে ভালোবাসবে বলো? বলো?

হঠাৎ দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে হীরেন শিশুর মতন কাঁদতে শুরু করে।

হরিণ শিশু

বারান্দার সিঁড়িতে তিন-চারটে ছেলেমেয়ে চুপ করে বসে থাকে এসে। ওরা কিছু চায় না, নিজেদের মধ্যেও কোনো কথা বলে না, শুধু নিঃশব্দে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কুচকুচে কালো রং, দশ থেকে বারোর মধ্যে বয়েস, ধুলো রঙের নেংটি মালকোঁচা করে পরা, ওদের মধ্যে একটি মেয়েও আছে, মেয়েটিকে দেখলে অড্রি হেপবার্নের কথা অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে। ওঁরাও না মুণ্ডা কোন জাতের মেয়ে যেন, দশ-এগারো বছর মাত্র বয়েস—তার সঙ্গে অড্রি হেপবার্নের কোনোই মিল নেই, তবু মুখের কোথাও কিছু একটা আছে, যেজন্য মনে পড়েই। সেজন্যই হয়তো একটু মায়া হয়, তা ছাড়া ভিতরে ভিতরে একটা কিছু কাঁটার খোঁচা রয়ে গেছে বোধহয়, তাই ওদের উঠে যেতেও বলতে পারি না। কিন্তু আমাদের অস্বস্তি হয়, নেতারহাটের ডাক-বাংলোর বারান্দায় বসে. সামনে বিশাল উপত্যকা ও মহিমার মতন গাঢ়নরম সূর্যালোক, সুবিমল এবং তার স্ত্রী ও শ্যালিকা অরুণা এবং বরুণার সঙ্গে চা খেতে খেতে সামনের ওই সিঁড়িতে-বসা মলিন বাচ্চাগুলোকে দেখে আমাদের অস্বস্তি হয়। পরশু বিকেলে আমরা এখানে আসার পর থেকেই, ওরা আমাদের সঙ্গে আছে, সবসময়।

সামনের সুরকি বেছানো লনে একটা কুকুর, বেশ দেখতে, শীতের জায়গায় পারিয়া কুকুরেরও বেশ ভরাট স্বাস্থ্য ও লোম-ভরতি গা হয় যেমন, কুকুরটা গ্রামোফোন রেকর্ডের কুকুরের মতন ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে বসে প্রতীক্ষায় থাকে। আমি পাঁউরুটির মাথার দিকটা পছন্দ করি না বলে টোস্টের শেষটুকু শূন্যে ছুঁড়ে দিই, কুকুরটা শূন্য থেকেই লাফিয়ে, সেটাকে মুখে পুরে নেয়। আর তখন সেই বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো আমার হাতের দিকে চেয়ে থেকে দৃষ্টি দিয়ে টোস্টের টুকরোটাকে শূন্যে অনুসরণ করে—একেবারে কুকুরটার মুখ পর্যন্ত।

শিরশির করে বয়ে যাচ্ছে ঠাণ্ডা হাওয়া, কলকাতার লোকেরা এখন কী রকম গরমে ভুগছে ভেবে ঠাণ্ডাটা আরও ভালো লাগে, সামনে পাতলা বাষ্পের মতন উড়ে যাচ্ছে মেঘ, মেঘ কিনা অবশ্য সন্দেহ হয়—কেননা শুনেছিলাম, প্রায় দুবছর এখানে বৃষ্টিই হয় নি, অথচ এ-রকম মেঘের ওড়াওড়ি এখানকার পাহাড়ের চূড়ায় তো রোজই দেখা যায়। ডিমের পোচটায় চামচ বসাতে গিয়ে অরুণা অসাবধানে নিজের শাড়িতে খানিকটা তরল হলদে লাগিয়ে ফেললো। তাড়াতাড়ি জলে

রুমাল ভিজিয়ে সেইখানটা মুছতে মুছতে অরুণা স্পষ্টই বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং ঝাঁঝালো গলায় বলে, তার চেয়ে চলো ঘরে বসে খাই, সব সময় মুখের দিকে ওরকম তিন-চারজন হাঁ-করে তাকিয়ে থাকলে কেউ খেতে পারে ? বরুণা বললো, তাই বলে এমন সুন্দর সকালটা ঘরে বসে নষ্ট করবো নাকি ? সব জায়গাতেই তো এরা—। টুরিস্ট স্পটগুলোতে অন্তত ভিখিরি আসাবন্ধ করতে পারে না কেউ ?

সুবিমলের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, সিগারেট ধরিয়ে সে অন্যমনস্ক গলায় বললো, এরা ভিখিরি নয় বোধহয়। লোকাল লোক। এবার যা অবস্থা হয়েছে এদিকে !

অরুণার শাড়িতে ডিমের কুসুমের চটচটে আঠা হয়ে গেছে, কিছুতেই উঠছে না, তার বিরক্তি তখনও লেগে আছে, বললো, গভর্নমেন্টও যা হয়েছে, লেফটই বলো, আর রাইটই বলো—এই, এই নে, এদিকে আয়

অরুণা নিজের প্লেট থেকে দুটো এবং আমার ও বরুণার প্লেট থেকে একটা করে টোস্ট তুলে নিয়ে ওদের দিকে হাত এগিয়ে বললো, এই নে, নিয়ে তোরা এবার যা বাপু।

ছেলেমেয়েগুলো পরস্পরের দিকে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে। একজন দুর্বল ও লাজুকভাবে এগিয়ে এসে টোস্ট চারটে নিয়ে ফিরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে বিলি করে দেয়—ওরা সবাই অত্যন্ত ভদ্র ভঙ্গিতে মুখ নিচু করে বিনা শব্দ করে খেতে থাকে।

সুবিমল উদারভাবে হেসে বলে, এদের ক'জনকে আর তুমি কতদিন খাওয়াতে পারবে বলো !

কুকুরটাও এবার ছোট্ট ঘেউ শব্দ তুলে কাছে এগিয়ে আসে। অরুণা এবার হেসে ফেলে। আবার তুই-ও আছিস ! নে—। বরুণার বাকি টোস্ট টাও অরুণা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল দূরে, কুকুরটা সেটা ছুটে গিয়ে ধরে মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে আবার রেকর্ডের ছবির মতন বসলো।

বরুণা বললো, ওরা কিন্তু গেল না।

অর্থাৎ ছেলেমেয়েগুলো তখন সিঁড়িতে বসে আছে আমাদের দিকে তাকিয়ে। আমি অরুণাকে রাগাবার জন্য বললুম, এই একটা মুশকিল, আমাদের খাবার সময় যদি একটা কুকুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—তা হলে খারাপ লাগে না। কিন্তু যদি আর কয়েকটা মানুষ তাকিয়ে থাকে, তা হলেই বিশ্রী লাগে !

বরুণা আশানুরূপ রেগে উঠলো এবং দর্পিত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এইবার বুঝি আপনার লেকচার শুরু করবেন ? আমরাই যেন সব দোষ করেছি, না ? এরা খেতে পাচ্ছে না বলে আমাদেরও বুঝি না খেয়ে থাকতে হবে ?

—তোমার অন্তত তাই-ই থাকা উচিত। দিনদিন যা স্বাস্থ্যখানা করছো।

—আর আপনার নিজের কি ? জন্মেও বুঝি আয়না দেখেন না ?

—আমার আবার আয়না দেখার দরকার কি ? তোমার চোখের মণিতেই তো আমি নিজেকে দেখতে পাই।

—ভালো হচ্ছে না বলছি। সব সময় যদি এরকম করেন, আমি তা হলে আজই চলে যাবো একা একা।

সুবিমল ও অরুণা হাসতে থাকে, আমি বরুণার দিকে তাকিয়ে বললুম, সে কি, চলে যাবে কি? তোমাতে-আমাতে যে আজ আলাদা ওয়াচ টাওয়ারে যাবো দুপুরবেলা, কথা ছিল! কাল যে বললে, মনে নেই!

—কখন বললুম? কী মিথ্যুক! বয়ে গেছে আপনার সঙ্গে আলাদা যেতে।

—তা হলে যাওয়াই হবে না। এখানকার নিয়ম জানো না, ওয়াচ টাওয়ারে দু'জন করে আলাদা যেতে হয়।

—মোটেই সে রকম কোনো নিয়ম নেই। ভ্যাট্! যদি থাকেও তা হলে আমি জামাইবাবুর সঙ্গে যাবো।

কিন্তু সুবিমল কি ওর বউকে আমার সঙ্গে ছাড়বে?

সুবিমল গম্ভীরভাবে বললো, আমি ওর সঙ্গে আমার বউকে কিছুতেই একা যেতে দেবো না! অরুণা ঠোঁট উলটে স্বামীকে এক খোঁচা মেরে বললো, ইস—। বরুণা তার সতেরো বছরের ছেলেমানুষী সিরিয়াসনেসের সঙ্গে বললো, তাও যেতে হবে না। প্রথমে আমি আর জামাইবাবু যাবো, তারপর ফিরে এসে জামাইবাবু আর দিদি, তারপর আপনি আর জামাইবাবু কিংবা আপনি একা—

—দিদি আর জামাইবাবু যখন ওপরে যাবে, তুমি তখন নিচে আমার সঙ্গে —এ যে বাঘ, ছাগল আর পানের ধাঁধা হয়ে গেল। জানো ধাঁধাটা?

বরুণা শব্দ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমার ধাঁধা জানার সময় নেই।—তারপর রাগ প্রকাশের তীক্ষ্ম গলায় সেই ছেলেমেয়েগুলোর উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠলো, এই, আভি যাও না! সব সময় জ্বালাতন!

আমি মুচকি হেসে বললুম, দেখো, আমি জানি ওদের কী রকমভাবে বিদায় করতে হয়। দেখবে?

পকেট থেকে একটা নোট বার করে বললুম, এই বাচ্চা, ইধার কাঁহাপর সিগরেট মিলতা হ্যায়?

ওরা পরস্পরের দিকে আবার তাকালো। একজন উত্তর দিল, হাঁ সাব, কোপারিটিব মে।

আমি একটা খালি সিগারেট প্যাকেট দেখিয়ে বললুম, এইসা সিগারেট চার প্যাকেট লে আও। চার আদমি চলা যাও, লানে সে সবকইকো দশ নয়া করকে বখ্‌শিশ মিলে গা। না, এই লেড়কি—অড্রি হেপবার্ন'কো পনেরো নয়া।

অরুণা অবাক হয়ে বললো, অড্রি হেপবার্ন?

আমি হাসতে হাসতে বললুম, বাচ্চা মেয়েটাকে ঠিক অড্রি হেপবার্নের মতন দেখতে না? চোখগুলো দেখো?

বরুণা চূর্ণ হাসিতে ভেঙে পড়ে বললো, ইস, অড্রি হেপবার্ন'কে আপনি ভিক্ষে দেবেন, কী অহংকার?

আমি বললুম, ভিক্ষে তো নয়, পারিশ্রমিক।

—দেখবো, কতবার আপনি ওদের দিয়ে সিগারেট আনান।

দুপুরের খাবারটা আমরা ভেতরের ডাইনিং রুমে বসেই খেলুম। ডাক-বাংলোর মুসলমান খানসামার রান্নার হাতটা বড় ভালো. চমৎকার বিরিয়ানি আর মুর্গির রোস্ট বানিয়েছে।

আজ সারাদিনেই রোদের তাপ হলো না, মিহিন বাতাসে আজ নরম ছায়ার দিন, এই সব দিনে বেঁচে থাকা বড় রমণীয় মনে হয়। বরুণা ঘরের মধ্যে থাকা একেবারে পছন্দ করে না, তার সতেরো বছরের চঞ্চল বয়েস তাকে সব সময় বাইরে টানে। দূরের পাহাড়ের আলোছায়ার গাঢ়ত্ব সারাদিন অনবরত পালটায়, বহু-দূরবিস্তৃত উপত্যকা দেখেও পুরোনো হয় না, চোখ ক্লান্ত হয় না, সুতরাং এই সব দিনে, দুর্লভ ছুটির বেড়াতে আসায় বরুণার ঘরের মধ্যে না থাকার ইচ্ছেটাই স্বাভাবিক! সুবিমলের অবশ্য তিন বছর হলো বিয়ে হয়েছে, কিন্তু সে এখনো নানা অজুহাতে অরুণাকে নিয়ে মাঝে মাঝেই ঘরে থাকতে চায়। সুতরাং চা খাবার পর, আমি একাই বরুণাকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। জংলা পথ দিয়ে রেঘু ওয়াচ টাওয়ারে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এলাম দু'জনে। ওয়াচ টাওয়ারে উঠলে—যতদূর চোখ যায় শুধু জঙ্গল আর পাহাড় চোখে পড়ে। বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে যে সৌন্দর্য, তা এখানেই।

আরও দু-একটা জিনিস চোখে পড়ে, অসংখ্য গাছ রোদ্দুরে একেবারে ঝলসানো, এ-বছর তাদের নতুন পাতা জন্মায় নি। বনের মধ্যে একটা শুকনো রেখা—এককালে ওখানে ঝর্ণা বা নদী ছিল বোধহয়। বৃষ্টিহীন রুক্ষতার চিহ্ন চারদিকে ছড়ানো। দূরে দেখা যায়, কোথাও কোথাও পাহাড়ের ঢালুতে জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষের জমি। সেখানে শুকনো, রং-জ্বলা ধান বা ভুট্টার চারা-গুলো মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছে। আমার চোখ এমন, সেই রুক্ষতার মধ্যেও একটা সৌন্দর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করে। রুক্ষতার সুদূরপ্রসারী ফলাফলের কথা মনে আসে না। শুধু একদিকে মাত্র একটা জলাশয়, লেকের মতন, পাড় বাঁধানো,—বুঝলুম, আমাদের ডাকবাংলোয় ওখান থেকেই জল আসছে, এখানকার ইস্কুলেও বোধহয় ঐ জায়গা থেকেই জল যায়। যতদূর চোখ যায়, ঐ একমাত্র জলের জায়গা—অনেক কষ্টে বোধহয় ওটা বাঁচানো। অবিরাম পাম্পের ফটফট শব্দ কানে আসছে।

বরুণা বলেছিল, দেখেছেন, কী সুন্দর, পাহাড়ের ওপরে একটা লেক? বিকেলে আমরা সবাই ওখানে বসবো, অ্যাঁ? আচ্ছা, এই জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার নেই?

আমি বললুম নিশ্চয়ই আছে। এই পালামৌ জেলার সেই বাঘের কথা সঞ্জীবচন্দ্রের লেখায় পড়ো নি? এসব জঙ্গলে হাতি পর্যন্ত আছে শুনেছি। হরিণ-টরিণ তো অজস্র।

—এখান থেকে একটা বাঘ দেখা গেলে বেশ হতো না?

আমি উৎকটভাবে চিৎকার করে উঠলুম, 'হালুম!' তারপর বললুম, এই তো বাঘ, তোমার এত কাছে, এইবার—!

বরুণা কৃত্রিম কোপে আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, যাঃ! এমন জোর চেঁচিয়েছেন। তারপরই ওয়াচ টাওয়ারের নিচের দিকে তাকিয়ে বরুণা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিল। এখানেও এসেছে? পাগল করে ছাড়বে—সত্যি ভালো লাগে না।

সেই তিন চারটে বাচ্চা ওয়াচ টাওয়ারের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে, ওপরে মুখ করে আমাদের দেখছে। সেইরকম শব্দহীন, কথাহীন, তাদের চেয়ে থাকা। বরুণা বলেছিল, এখানেও কি আমরা খাবার খেতে এসেছি নাকি? সব সময় আমাদের সঙ্গে! কেন?

আমি আলতোভাবে বরুণার কাঁধে হাত দিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললুম, অত বেশী গুরুত্ব দিচ্ছো কেন তুমি? ওদের দিকে না তাকালেই তো হয়। কত ভালো জিনিস রয়েছে, এসো আমরা সেইগুলো দেখি।

—তা মোটেই পারা যায় না। সব সময় ওরকম বুভুক্ষুর মতন চেয়ে আছে —কী দেখে বলুন তো? সব সময় আমরা খাচ্ছি নাকি? সকালেই তো পয়সা দিলেন।

—পয়সা চাইছে না, হয়তো আমাদেরই দেখছে। আমাদের দেখতে ওদের ভালো লাগে। আমরা যেমন এই পাহাড়, খোলা আকাশ, জঙ্গল দেখতে এখানে এসেছি—তেমনি ওরাও আমাদের চোখ ভরে দেখছে। আমাদের ভালো ভালো পোশাক, আমরা ভালো ভালো খাবার খাই, আমাদের দেখলে তো ওদের ভালো লাগবারই কথা! ওদের তো জঙ্গল কিংবা পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখার কথা নয়!

—যাই বলুন, এসব ভালো লাগে না। তা বলে কেউ বেড়াতে আসবে না? বেড়াতে এসেও যদি সব সময় এ-রকম—

—বেড়াতে এসে আমাদের পক্ষে দু'একটা ব্যাপারে চোখ বুজে থাকাই ভালো। আনন্দ ফুর্তি করতে গেলে, দু' একটা ছোটোখাটো জিনিসকে বিদায় দিতেই হয়, মনের ভেতরের দু' একটা ব্যাপারকে মেরে ফেলাই ভালো। তুমি ছেলেমানুষ তো, বুঝতে পারছো না। বেড়াতে আসা তো মানুষের পক্ষে দরকারই। আমরা বেড়াতে এসেছি, আমরা এখন ছুটিতে আছি, আমরা এখন শুধু আনন্দ করবো। বেড়াতে এসেও না-খেতে পাওয়া মানুষের কথা ভাবলে চলে নাকি? তাহলে তো সবই মাটি—সেজন্য ওসব ভুলে থাকতে হয়, দেখো না, আমরা বড়রা কী-রকম ভুলে থাকতে পারি, বড়জোর দু'চার পয়সা বকশিশ, তার বেশী আর আমাদের করবার কীই-বা আছে!

বরুণা তবু মুখ ভার করে থাকে। বিরক্তির সঙ্গে বলে, আর পারি না! এক এক সময় ইচ্ছে করে, ছুটে গিয়ে গুম্ গুম্ করে ওদের পিঠে কিল মারি!

ফেরার পথেও সেই বাচ্চাগুলো আমাদের পিছু নেয়। ডাকবাংলো পর্যন্ত এসে আবার বিশবস্তভাবে সিঁড়িতে বসে থাকে. একটুও গোলমাল করে না, কিছু চায় না, দু' একজন নতুন বাচ্চা এসেও ওদের দলে যোগ দেয়।

শীতের জায়গায় খিদে বেশী পায়, তাছাড়া অনেকখানি হেঁটে আসার ফলে চনচন করছিল খিদে, পাঁচ সাত মিনিটেই খাওয়া শেষ হয়ে যায়। ডাইনিং রুমের পর্দা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে, সেই ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে সিঁড়িতে বসে-থাকা এখন আট ন'টি কচি মুখ, আমি সেদিক পিছন ফিরে বসি। কফিতে চুমুক দিতে দিতে সুবিমল ওর সাউথ ইণ্ডিয়া ভ্রমণের গল্প শোনায়। সেই গল্প শেষ হলে, নেতারহাট থেকে আমাদের যে মাকক্লাস্কিগঞ্জে যাবার প্রোগ্রাম—কিন্তু আমাদের ফাণ্ডে কুলোবে কিনা সেই সম্পর্কে আলোচনা করি। আবার এসব অঞ্চলে কবে আসা হয় কে জানে, এবারেই দেখে যেতে পারলে ভালো হতো!

বিকেলবেলা ফ্লাস্কে চা ভরে আমরা সেই জলাশয়ের ধারে গিয়ে বসলুম। মানস সরোবরের হাঁসেরা এই লেকেরও খবর রাখে, বেশ বড় একটা হাঁসের ঝাঁক সাতনরী হারের মতন জলে ভাসছে। একদিকে উঁচু বাঁধানো পাড়. পাহাড়ের চূড়ায় এরকম একটা বড় পুকুর দেখতে পাওয়া সত্যি আশ্চর্যের, বোধহয় পাম্প পাহাড় খুঁড়ে জল বার করেছে।

সুবিমল অরুণাকে গান গাইবার জন্য খুব খোঁচাচ্ছে, আর অরুণা নানান ওজর আপত্তি তুলছে। রাঁচীতে পচা দই খেয়ে তিনদিন ধরে নাকি তার গলা ভেঙে আছে। আসলে খালি গলায় গান করলে নাকি অনবরত স্কেল্স বদলে যায়—আর সেটা গলার পক্ষে খারাপ. অরুণার এই ধারণা। অরুণার গান যাতে আমাকে না শুনতে হয়, তাই বারবার আমি নানান গল্পের প্রসঙ্গ টানছিলুম। বরুণা গান জানে না. সে উদয়শঙ্করের স্কুলে নাচ শিখছে, আমি ভাবছিলুম, তাকে এখানে একটু নাচ দেখাতে বলে রাগিয়ে দেব কিনা। বরুণা আপনমনে ছোট ছোট পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে জলে ছুঁড়ছিল।

সেই বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে মাত্র দু'জন এখনও আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। সেই মেয়েটি, আর একটা ছেলে, খানিকটা দূরে চুপ করে বসে আছে। এটা ঠিক, ওরা আমাদের কাছে ভিক্ষে চায় না. কিছু দিলে নেয় বটে, কিন্তু মুখ ফুটে খাবারও চায় না। শুধু চুপচাপ আমাদের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

সুবিমল হঠাৎ বললো, সুনীল, তুই ঠিকই বলেছিস. ঐ মেয়েটার সঙ্গে অড্রি হেপবার্নের বেশ মিল আছে। কী সুন্দর চোখ দুটো।

অরুণা বললো, আহা দেখলে মায়াও হয় কিন্তু আমরা কি করবো বলো, কষ্টও লাগে, অথচ কত আর খেতে দিতে পারি বলো, এই খুকী শোন তো এদিকে —

মেয়েটা সেই রকম বসে বসেই চেয়ে রইলো। অরুণা আবার বললো, এই খুকী, শোন্ না, হিঁয়াপর আও, আও, ভয় কি।

মেয়েটি অত্যন্ত সন্ত্রস্তভাবে এবার আস্তে আস্তে উঠে এলো, অরুণা তার হাত ধরে বললো, কী সুন্দর ঢলঢলে মুখখানা, রংটা যদি ফর্সা হতো, তা কালোই বা খারাপ কী—! কথার শেষ অংশে অরুণা তার স্বামীর দিকে ভ্রূভঙ্গি করলো। সুবিমলের গায়ের রং প্রায় আমারই মতন, সুতরাং সে উদার সুরে বললো, কালোই তো জগতের আলো।

এই সময় একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো। বরুণা হঠাৎ বিষম অবাক হয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো, ওমা ওকি, দেখো, ছাগলছানা, না হরিণ? হরিণ!

আমরাও ঘুরে তাকিয়ে দেখলুম, একটা সত্যিকারের বাচ্চা হরিণ আমাদের থেকে কিছুটা দূরে এসে দাঁড়িয়ে সন্ত্রস্তভাবে তাকিয়ে আছে! তখনো সন্ধে নামেনি, চারপাশে স্পষ্ট আলো, তার মধ্যে একটা হরিণ এসে আমাদের অত কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে! হরিণটা এক পা এক পা করে জলের দিকে এগোচ্ছিল। আমরা সবাই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, বরুণা খুব আস্তে আস্তে আমাকে বললো, কী সুন্দর! এত কাছে, ধরা যায় না? কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তা হলে পুষবো।

সেই অড্রি হেপবার্ন মেয়েটা সুবিমলের আড়ালে ছিল বলে প্রথমটায় হরিণ-টাকে দেখতে পায় নি তারপর দেখতে পেয়ে সে হঠাৎ একটা দুর্বোধ্য ভাষায় সাঙ্ঘাতিক চিৎকার করে উঠলো। মেয়েটাকে এর আগে আমি কথা বলতেই শুনিনি, সে যে গলা দিয়ে অত জোর শব্দ করতে পারে ভাবিনি—সেই রকম চিৎকার করতে করতে মেয়েটা দৌড় লাগালো।

চিৎকার শুনে হরিণটাও ভয় পেয়ে পিছন ফিরে ছুটলো, বাঁধ পেরিয়ে মাঠে নামলো, কিন্তু আশ্চর্য, বেশী দূর গেল না, খানিকটা দূরে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আবার এক পা এক পা করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। হরিণটার কাণ্ড দেখে আমি থ, মানুষের এত কাছে আসবার ওর এত ইচ্ছে কেন কে জানে। সুবিমল দুঃখিত গলায় বললো, পুয়োর থিং! হরিণটা আজই মারা যাবে।

বরুণা চেঁচিয়ে উঠলো, মরে যাবে? কেন?

—বুঝতে পারছো না? ও তো মরীয়া হয়ে এখানে এসেছে জল খেতে। জঙ্গলে কোথাও তো এখন জল নেই, বোধহয় তিন চার দিন এক ফোঁটাও জল পায় নি—ছোটা দেখলে না, কী রকম নড়বড়ে, ঐ কি হরিণের ছোটা?

বরুণা ভয়ার্ত গলায় বললো, জল খাবে? চলুন, আমরা এখান থেকে চলে যাই, তা হলে ও জল খেতে পারবে, চলুন।

—আমরা সরে গেলেই ও জল খেতে পাবে ভেবেছো? ওর আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, আহা, ভালো জাতের হরিণ, স্পটেড ডিয়ার—

সুবিমলের ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে দেরি হলো না, সেই মেয়েটার সঙ্গে আট-নটা বাচ্চা ছুটে এলো, সবারই হাতে ছোটখাটো লাঠি, দু'জনের সঙ্গে তীর ধনুক,

হরিণটা ততক্ষণে আবার বাঁধের ওপর উঠে এসেছিল। এবার আবার ভয় পেয়ে ছুটলো, বাঁধের ওপাশে অনেকখানি মাঠ, ছোট ছোট গাছে ভরা, বহু দূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। বাচ্চাগুলো হৈ-হৈ করে হরিণটাকে তাড়া করলো।

বরুণা বললো, ওরা হরিণটাকে মারবে? সুনীলদা বারণ করুন. উঃ না—না, বারণ করুন। কী সুন্দর তুলতুলে হরিণটা। সুনীলদা, আপনি ওটাকে ধরে আনুন না—

যেন বরুণা আমাকে সোনার হরিণ ধরে আনতে বলছে. সেই হিসেবে আমি শুধু বললুম, পাগল! হরিণ কখনো ধরা যায়!

—তাহলে, ওদের মারতে বারণ করুন।

আমি বললুম, আমি বারণ করলেই বা ওরা শুনবে কেন?

সিনেমা দেখার মতন আমরা সমস্ত দৃশ্যটা দেখলাম। হরিণটা এত দুর্বল যে, মোটেই জোরে ছুটতে পারছিল না। বাচ্চাগুলো তীর, পাথর লাঠি অনবরত ছুঁড়ছে, এবার লাঠির ঘা লেগে হরিণটা মাটিতে পড়ে গেল, আবার উঠে ছুটলো, তারপর একটা মোক্ষম তীর লাগলো ঘাড়ে, এবার চিৎ হয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগলো, তীর সমেত আবার খানিকটা ছোটার চেষ্টা করেছিল, ততক্ষণে বাচ্চারা ওর কাছে পৌঁছে গেছে, দুজনে দমাদম করে লাঠি দিয়ে পেটাতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গেই ছটফটানি শেষ। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে পাঁচ মিনিটও লাগলো না।

অরুণা বললো, ইস্—এইমাত্রও বেঁচে ছিল, কী রকম করুণভাবে জলের দিকে তাকিয়ে ছিল। চলো এবার বাংলোয় ফিরে যাই।

সুবিমল বললে, দাঁড়াও না, দেখি।

—না, চলো, রুনিটা একেবারে ছেলেমানুষ, এসব সহ্য করতে পারে না একটুও। আরে, কান্নার কি আছে।

বরুণা মুখ ফিরিয়ে বললো, আমি কাঁদছি না।

—কাঁদছিস না তো চোখটা মুছে নে। সত্যি এসব দেখাও পাপ চলো চলো, আমরা এখান থেকে যাই।

বরুণা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে কঠিন গলায় বললো, না, আমি এখন যাবো না।

সুবিমল শ্যালিকার কাঁধে হাত রেখে নরম গলায় বললো, আমার রুনিসোনার বড় মনে লেগেছে, না? অত মন খারাপ করো না, দেখো বাচ্চাগুলো কী রকম আনন্দ করছে। আজ অনেকদিন বাদে ওরা বোধহয় পেট পুরে মাংস খাবে। ওরকম আনন্দের জন্য তো দু' একটা জিনিস মাঝে মাঝে মারতেই হয়। চোখের সামনে বলে খারাপ লাগছে, কিন্তু তোমাকেও যদি হরিণের মাংস দেওয়া হতো—

বাচ্চাগুলোর উল্লাস তখন দেখবার মতন, হরিণটাকে টানতে টানতে বাঁধের কাছে নিয়ে এসে ওরা প্রায় নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে, হরিণটার ঘাড় ভেঙে

গেছে, মুখে টাটকা গাঢ় রক্ত, তখনও বোধহয় একটু একটু প্রাণ ছিল, সেই মেয়েটা তীরের ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পেটটা ফুটো করে নাড়িভুঁড়ি বার করে ফেললো, কী জ্বলজ্বলে হাসি মেয়েটার মুখে তখন। নিজেদের মধ্যে হাত পা নেড়ে কী যেন আলোচনা করলো ওরা, আন্দাজে বুঝতে পারলুম, হরিণটাকে ওরা বোধহয় গ্রামের মধ্যে নিয়ে যেতে চায় না—তাহলেই তো আবার অন্যদের ভাগ দিতে হবে। ওরা সেখানেই, মাঠ থেকে ডালপালা জড়ো করে আগুন জ্বালালো।

আমরা বাঁধের ওপর বসে ওদের দেখতে লাগলুম। আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে এলো, উজ্জ্বল হয়ে এলো আগুনের রং, হরিণটাকে ওরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঝলসাতে লাগলো। বরুণা হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে একদৃষ্টে সেই হরিণটার মসৃণ চামড়ায় আগুন লাগা দেখছে। ওদের আর দেরি সইছে না, মহানন্দে চেঁচামেচি করতে করতে একটু বাদে বাদেই এক এক টুকরো কেটে নিয়ে চিবিয়ে দেখছে, সেদ্ধ হয়ে গেছে কিনা।

আমি সুবিমলকে বললুম, এবার সত্যিই আমাদের চলে যাওয়া উচিত। ওদের খাবার সময় আমরা যদি এরকম একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি তাহলে ওদেরও বোধহয় অস্বস্তি লাগবে।

সুবিমল বললো, যা বলেছিস্! চল উঠে পড়ি, আমারও লোভ লেগে যাচ্ছিল, জিভে জল এসে গেছে প্রায়।

নবাব বাহাদুর স্টেশনে গাড়ি পাঠাবেন বলেছিলেন! গাড়ি দেখে হাসতে হাসতে বাঁচি না।

স্টেশনের নাম বাগোটা, ফারাক্কাবাদ প্যাসেঞ্জার সেখানে পৌঁছলো রাত পৌনে চারটেয়। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, এ স্টেশনে উঁচু প্লাটফর্ম পর্যন্ত নেই। ট্রেন থেকে নেমে আমি আর সুবিমল অন্ধকারে চোখ সইয়ে নেবার চেষ্টা করছি, এমন সময় দুটি লোক লণ্ঠন নিয়ে এসে বললো, বাবুরা কলকাতা থেকে আইসছেন? নবাব বাড়িতে যাবেন তো? আসেন!

এই পাণ্ডববর্জিত স্টেশনেও গোটা তিরিশেক লোক নেমেছে, তার মধ্যে ঠিক আমাদের কি করে চিনতে পারলো কে জানে! হয়তো আর সবাই স্থানীয় লোক, তাদের অন্ধকারেও চেনা যায়! কিংবা আমাদের মুখ কিংবা দাঁড়াবার ভঙ্গিতে কলকাতার নাম লেখা আছে। সুবিমল কিছুতেই অবাক হয় না সহজে, সপ্রতিভভাবে বললো, চল সুনীল! লোক দুটিকে জিজ্ঞেস করলো, গাড়ি আছে তো?

ছপ্ ছপ্ করছে কাদা, জুতোর জন্য চিন্তা করে লাভ নেই, আমারা প্যাণ্ট উঁচু করে রেললাইন পেরিয়ে এলাম। খানিকটা পিচ্ছল ঢালু জায়গা দিয়ে নামবার পর অস্পষ্টভাবে দেখা গেল, গোটা তিনেক গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তারই একটা নবাব বাহাদুরের।

সুবিমল হাসতে হাসতে বললো, দিস ইজ টু মাচ্। নবাবের অবস্থা খারাপ তা জানি, কিন্তু অন্তত একটা লঝ্ঝরে ফিয়াট-টিয়াট আশা করেছিলাম।

—আমি ভাই কখ্খনো গরুর গাড়িতে চাপিনি। আমার পক্ষে সম্ভব নয় ওতে যাওয়া।

—চল্ না, একটা নতুনত্ব হবে।

—না ভাই, তার চেয়ে হেঁটে যাবো!

সুবিমল লোক দুটিকে জিজ্ঞেস করলো, এখান থেকে কতটা দূর ভাই?

—আজ্ঞে সওয়া চার মাইল।

সুবিমল বললো, এতখানি হাঁটতে পারবি?

—কেন পারবো না কেন? বেশ জোরের হাওয়া গায়ে লাগাতে লাগাতে চলে

যাবো।

—হেঁটে যেতে পারবেন না বাবু। রাস্তা বড় খারাপ!

সুবিমল বললো, চল্, এতেই উঠে পড়ি। নৌকোয় চেপেছিস তো! সেইরকমই দুলতে দুলতে যাবে—শুধু কাল সকালে গায়ে একটু ব্যথা হবে!

—গায়ে ব্যথা হলে গা টিপে দেবার লোক পাওয়া যাবে?

—যেতে পারে, নবাব বাড়ি যখন, যদি ছিটে-ফোঁটাও থাকে।

লোক দুটি বসল সামনে, গরুর ল্যাজ মুচড়ে হিঃ হেট্ হেট্ হেট্ করে উঠলো। আমি আর সুবিমল পেছনে পা ঝুলিয়ে বসে সিগারেট ধরালাম। ক্রমে ভোর হচ্ছে, সূর্য এখনো উঠেনি, আকাশের এক দিকটা কাঁচা ডিমের কুসুম-রাঙা। ভোরবেলার সূর্যকে শেষ কবে দেখেছি, মনেই পড়ে না।

সুবিমলকে বললুম, আজ অনেকদিন পর সূর্যোদয় দেখবো. ভাবতেই বেশ আরাম লাগছে।

সুবিমল আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করলো, যে রকম মেঘ জমে আছে তাতে আজ আর সূর্য দেখা যাবে বলে মনে হয় না!

—এটা খুব অন্যায়! আজ একদিন চান্স পেয়েছি ভোর পাঁচটার সূর্য দেখার।

বলতে বলতেই সুবিমলের কথা অগ্রাহ্য করে আমবাগান ঠেলে সূর্য উঠে এলো। ঠিক যেন লাফিয়ে উঠলো মনে হয়, একটা টুকটুকে লাল চারনম্বর সাইজের বল্, যেন রেশমে তৈরি—এক মুহূর্তেই ঠাণ্ডা আলোয় ভরে গেল জগৎ সংসার। সব কিছু দেখতে পেলাম। দুপাশে ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে চলেছে গরুর গাড়ি, অদূরে আমবাগান ঘেরা একটা বিশাল পুকুর—তার নিস্তরঙ্গ জলে যেন একটা সর পড়ে আছে। দুতিনটে মুর্গী ডেকে উঠলো সমস্বরে—এ ছাড়া চতুর্দিকে একটা ঠাণ্ডা স্তব্ধতা। রাস্তার পাশে একটা ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের চিক্কন সবুজ পাতায় কাঁচা রোদ্দুরের বিচ্ছুরিত লাল আলো পড়ে অদ্ভুত বর্ণ তৈরি হয়েছে. গোটা গাছটাকেই মনে হয় একটা ঝাড় লণ্ঠন!

আমি সুবিমলকে বললাম, যাই বলিস্ এখনো এক এক সময় প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে বেশ ভালোই লাগে।

সুবিমল বললো. এক এক সময় কেন? প্রকৃতি ছাড়া আর কোথাও কোন সৌন্দর্য আছে নাকি?

—কেন, মেয়েদের?

—মেয়েদের সৌন্দর্য যদি তেমনই হবে, তবে মানুষ মেয়েদের দেখলেই অন্ধকার ঘরে নিয়ে যেতে চায় কেন?

একথার উত্তর দিতে আমি হাসলাম।

সুবিমল বললো, হাসলি কেন? উত্তর দে!

—সক্কালবেলাতেই এসব প্রশ্ন না তুললেই নয়! এখন এই ভোরের দৃশ্য

দেখতে আমার খুবই ভালো লাগছে বটে, কিন্তু পুকুরঘাটে যদি একটা মেয়ে দেখতাম, তা হলে তার দিকেই আমার চোখ যেত। এটা ভাই সোজা সত্যি কথা।

—আমারও যেত। ঐ দ্যাখ্—

একঝাঁক হাঁস তাড়াতে তাড়াতে ছুটে যাচ্ছে দুটি মেয়ে। তারা ঠিক বালিকা নয়, যুবতীও নয়। যুবতীর চেয়ে কিছু কম, বালিকার চেয়ে কিছু বেশী—অথচ গ্রামের মেয়েদের ঠিক কিশোরী বলা যায় না কখনো। মেয়ে দুটিকে সুন্দরী বলা যায় না, এই সকালের মসৃণ আলোতেও তাদের দারিদ্র্যের বিবর্ণতা চাপা পড়ে নি, একটা মেয়ে হাঁসগুলোর ছটফটানিতে বিরক্ত, একজন খুশী। এক পরেই তারা বাঁশবনের ওধারে আড়াল হয়ে গেল।

রাস্তায় হাঁটুসমান কাদা, গরুর গাড়িটা যাচ্ছে খুবই আস্তে, আমি বললাম, নবাব বাহাদুরকে দোষ দেওয়া যায় না। এই রাস্তায় গরুর গাড়ি ছাড়া আর কিছু চলাই তো অসম্ভব!

সুবিমল চিন্তিতভাবে বললো, এই একটাই যদি স্টেশনে যাবার রাস্তা হয়, তা হলে তো মুশকিল। কাল ফিরবো কি করে। সঙ্গে অনেক লটবহর থাকবে!

—আবার গরুর গাড়ি! চিন্তা কি?

—যদি আজও বৃষ্টি হয়, তাহলে এ রাস্তায় বোধহয় গরুর গাড়িও চলবে না!

—এখানকার লোকজন বর্ষাকালে যাতায়াত করে কি করে?

সুবিমল মুখ ফিরিয়ে অদ্ভুতভাবে হেসে বললো, এখানকার লোকজন কাদা ভেঙেই যায়, অথবা যায় না। কোনো ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশের অনেক গ্রামই এই রকম—তোর মতন শহরে বাবুরা কোনো খবর রাখে না। মুর্শিদাবাদ জেলার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ!

আমিও কি অদ্ভুতভাবে হাসতে জানি না? বছর দু'এক আগে একবার বিলেত ঘুরে আসার পর থেকেই সুবিমলের দেশপ্রীতি খুব বেড়ে গেছে! আমিও সুবিমলের অনুকরণে হেসে বললুম আমি পূর্ব বাংলার যে গ্রামে জন্মেছিলুম, সেখানে এরকম রাস্তাও নেই। সেখানে লোকে যাতায়াত করে নৌকায়। আমি গরুর গাড়ির ব্যাপারটা তেমন দেখিনি।

—কবে কোন্ কালে পূর্ববঙ্গে ছিলি, এখনও তাই ধুয়ে খাচ্ছিস।

—কিন্তু গ্রাম দেখলেই যে আমার সেই গ্রামটার কথাই শুধু মনে পড়ে—ধান-ক্ষেতের ওপর দিয়েও নৌকো চলে সেখানে।

গর্তে গরুর গাড়িটার চাকা আটকে গেছে। লোক দুটো নিঃশব্দে নেমে পড়ে চেষ্টা করছে ঠেলে তুলতে। চটচটে আঠালো কাদা। একটু আগে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে যে-টুকু খুশী খুশী লাগছিল—এখন এই বিচ্ছিরি কাদায় ভরা রাস্তা দেখে সেটুকু অন্তর্হিত হয়ে গেছে। লোকদুটো প্রাণপণে ঠেলছে গাড়িটা, গরু দুটোর পিঠ বেঁকে গেছে, তবু গাড়ি ওঠে না।

সুবিমল নিম্নস্বরে বললো, আমরা দু'জনে গাড়িতে বসে আছি আর ওরা ঠেলছে, এটা বড্ড খারাপ দেখাচ্ছে।

—আমাদেরও নামা উচিত?

—বড্ড কাদা, মাইরি। প্যাণ্ট-ফ্যাণ্টের আর কিছু থাকবে না।

—তাহলে? হয় আমাদের অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য না করা উচিত, অথবা কাদার মধ্যে নেমে পড়ে ঠেলতে হয়। কোন্‌টা করা হবে? আমরা নবাব সাহেবের অতিথি—ওরা অবশ্য আশা করে না—আমরা গাড়ি ঠেলবো।

—নাঃ, নেমে পড়াই উচিত!

জুতো খুলে রেখে আমরা নেমে পড়তেই পায়ের ডিম পর্যন্ত কাদায় ডুবে গেল। থকথকে এঁটেল মাটি কামড়ে ধরলো যেন পা। লোক দুটো একবার ক্ষীণ আপত্তি করলো বটে, না, না, বাবু, আপনারা কেন কাদার মধ্যে নামবেন··· কিন্তু মনে হলো, ওরা যেন আশাই করছিল আমরা নামবো। সম্ভবত এরকম অবস্থায় স্বয়ং নবাব সাহেবও হাত লাগাতে বাধ্য হন।

গাড়ি উঠলো বটে কিন্তু আর একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ঠেলাঠেলির সময় আমার চশমাটা ছিটকে গিয়ে লাগলো গাড়ির চাকায়—কাচ ভাঙলো না বটে, কিন্তু একটা ডাঁটি গেল আলগা হয়ে, সেটা তুলতে গিয়ে হাত ডোবাতে হলো কাদায়। সেই রকম, হাতে পায়ে চশমায় কাদা মাখা অবস্থায় পৌঁছুলাম নবাব বাড়িতে।

নবাবকে একটা কুঁড়েঘরের বাসিন্দা দেখলেও আমি অবাক হতাম না। মনে মনে তৈরি হয়েই ছিলাম। খানিকটা যেন জানতামই, গিয়ে দেখবো একটা আধবুড়ো লোক ভাঙা লঝ্‌ঝরে ছোট বাড়িতে থাকে, পুরোনো কালের কথা তুলে বড় বেশী বক্‌বক্‌ করে। আগ্রা-লক্ষ্ণৌতে দেখেছি অনেক টাঙ্গাওয়ালা বছরে একখানি জরির পোশাক পরে ট্রেজারি থেকে একটাকা দেড় টাকার সরকারী ভাতা নিয়ে আসে। তারা সবাই আমীর ওমরাহের বংশধর। কাশীতে শংকর আদিত্য বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, একটা স্টেশনারি দোকানের মালিক, দারুণ কৃপণ আর বাচাল—সেই ভদ্রলোকও বলেছিলেন তিনি প্রতাপাদিত্যের বংশের একটা শাখার উত্তরাধিকারী।

কিন্তু নবাব সাহেবের বাড়ি দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। রুমাল দিয়ে চশমার কাচ মুছে নিয়ে ভালো করে তাকিয়েও ঠিক বিশ্বাস হয় না। গ্রামের মধ্যে দিয়ে আসবার সময় একটাও পাকা বাড়ি দেখিনি, খুবই গরীবদের গ্রাম—আর এই নবাব বাড়ি প্রায় সিকি মাইল এলাকা জুড়ে এক বিরাট প্রাসাদ। অধিকাংশ জায়গাই ভাঙা, অনেক ঘরেরই ছাদ নেই, সেখানে জন্মেছে বট, অশ্বত্থ, চত্বর জুড়ে পড়ে আছে নানা রকম ভাঙা মূর্তি, ডানা ভাঙা পরী আর নাক কান ভাঙা প্রহরী। সিংহদ্বারের সিংহই মুণ্ডহীন, তবু তাদের আয়তন এবং দেহের কয়েকটি রেখা দেখেই বোঝা যায়, কি গর্বোদ্ধত ছিল তাদের চেহারা এক সময়।

সম্পূর্ণ প্রাসাদটিই যে এক সময় দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল, তাও বোঝা যায়, যদিও অক্ষত আছে সামান্য অংশই।

আমি সুবিমলের দিকে তাকিয়ে বললাম, একি ?

সুবিমল মুচকি হেসে বলে, আসল নবাবকে দেখে আরও অবাক হবি! তার মনে হবে ছবির বই থেকে উঠে এসেছে একজন মানুষ।

—তুই নবাবকে দেখেছিস ?

—হ্যাঁ। দুব'ার।

—আমাকে বলিস নি তো আগে! তুই যে বলেছিলি চিঠিতে যোগাযোগ তোর সঙ্গে ?

—তোকে বলিনি ইচ্ছে করেই। আস্তে আস্তে আরও অনেক কিছুই দেখবি।

—কিন্তু এ বাড়িতে আমরা থাকবো কোথায় ? এতো পুরোটাই ভাঙা মনে হচ্ছে।

—দ্যাখ না কি হয়।

চত্বরের মধ্যে গরুর গাড়ি থেকে নামলুম আমরা। চত্বরটার ঠিক মাঝখানে খানিকটা ঘেরা জায়গা, এক সময় ওখানে ফোয়ারা বসানো ছিল মনে হয়, এখনও নোংরা জল জমে আছে, মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দুটি শ্বেতপাথরের জলকন্যা। মূর্তি বানানো ইসলামে নিষিদ্ধ জানতাম, কিন্তু এ বাড়িতে সারাসেন্সি বা হিন্দু প্রভাব পড়েছে মনে হয়। চতুর্দিকে মূর্তির ছড়াছড়ি। সুবিমল এই সব পুরোনো মূর্তির ব্যবসা করে—সে খুঁজে খুঁজে দেখলো কোনোটা অক্ষত আছে কিনা। চত্বরের এক কোণে পাথরে বাঁধানো একটা বিরাট কুয়ো, অতবড় কুয়ো এর আগে দেখেছি শুধু ফতেপুর সিক্রিতে। সেই কুয়োর জল তুলে হাত পায়ের কাদা ধুয়ে নিলাম।

লোক দুটি জানালো, কুমার সাহেব বোধহয় এখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি। আপনারা আসুন, একটু বিশ্রাম করবেন। তারপর শুরু হলো সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে আমাদের যাত্রা। মনে হলো যেন চলেছি তো চলেইছি। দু'তিনটে দরদালান পেরিয়ে, ভাঙা ইঁট পাথর সরিয়ে সরু রাস্তা তৈরি হয়েছে—সেই পথ ধরে। শেষ পর্যন্ত এসে পেঁছুলাম প্রায় বাড়ির শেষ প্রান্তে, সে জায়গাটা একটু পরিচ্ছন্ন—একতলার ঘরগুলো মোটামুটি অটুট আছে—দোতলার ঘরগুলিতে ফাটল ধরেছে। একতলার একটা ঘরে বসানো হলো আমাদের—বহু পুরোনো আমলের সোফা কৌচে সাজানো ঘরটা—সব আসবাবই মলিন বিবর্ণ, ছাদ থেকে ঝুলছে বিরাট টানা পাখা—তার বর্ডারের রুপোলি জরি ধুলোর আস্তরণের মধ্যে সহজে বোঝা যায় না। মেঝেতে চটের মত যে জিনিসটা পাতা, অনেকক্ষণ তাকিয়ে আবিষ্কার করতে হয় এক সময় সেটা ছিল দামী গালিচা।

সুবিমল জিজ্ঞেস করলো, কেমন লাগছে ?

আমি বললাম, ঘরটা বেশ অন্ধকার। নবাব বাদশারা কি আগে এইরকম অন্ধকার ঘরে থাকতেন নাকি ?

—নবাব বাদশারা কেউ একতলার ঘরে থাকতেন না ! দোতলার সব ঘর ভেঙে পড়েছে কি না এখন !

—এরা কি সিরাজদৌল্লার বংশের কেউ নাকি ?

—সিরাজদৌল্লার বংশের কেউ শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিল নাকি ?

—সিরাজদৌল্লার মাসী-পিসী কারুর বংশ হতে পারে ?

—কে জানে, জানি না। তা নয় বোধহয়। এমনিই জমিদার বাড়ি ছিল হয়তো।

—তা হলে নবাব বাড়ি বলে কেন সবাই !

—অনেক মুসলমান জমিদার এক সময় ছোটখাটো নবাব হয়ে উঠেছিল। শুনতে পাচ্ছিস ?

—কি ?

—শানাই বাজছে। এবার নবাবের ঘুম ভাঙবে।

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললুম, শানাই বাজছে, কিন্তু রেডিওতে। তুই বুঝি ভেবেছিলি, নহবৎখানা থেকে শানাই বাজিয়ে নবাবের ঘুম ভাঙানো হচ্ছে ?

নবাব নামলেন একটু বাদেই। সুবিমল অতিশয়োক্তি করে নি. সত্যি ছবির বইয়ের মানুষই মনে হয়। অমন ফর্সা রঙের কোনো পুরুষ মানুষ আমি আগে কখনো দেখিনি। সাহেবদের ফর্সা রং এ ধরনের নয়। সত্যিকারের গৌরবর্ণ বলে একেই। চোখ দুটো টানা টানা, টিকোলো নাক, কালো কুচকুচে চুল—সব মিলিয়ে কার্তিক ঠাকুরের মতন। মেয়েলি চেহারা মনে হতে পারতো—কিন্তু কপালের বাঁ পাশে একটা লম্বা কাটা দাগ মুখখানাতে খানিকটা পৌরুষ এনে দিয়েছে। তিরিশ একত্রিশ বছর বয়েস হবে নবাবের, পাজামা আর গেঞ্জির ওপর একটা ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে এসেছেন।

সুবিমলের দিকে দু' হাত বাড়িয়ে বললো, আসুন আসুন! রাস্তায় কোনো অসুবিধে হয় নি তো ?

সুবিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, না, না ! আলাপ করিয়ে দিই, এই আমার বন্ধু সুনীল গাঙ্গুলি, আর ইনি হলেন মেহদী আলি সেলজুক্ !

আমার দিকেও সহৃদয়ভাবে দু'হাত বাড়িয়ে মেহদী আলি বললো, আপনি সুবিমলবাবুর দোস্ত, তার মানে আমারও দোস্ত। রাস্তায় আসতে কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই ? গরিবের দেশ—রাস্তাঘাটের অবস্থা বড্ড খারাপ।

আমি বললুম, না, কষ্ট তেমন হয় নি। বরং অন্যরকম লেগেছে, একথাই বলা যায়।

ঘর ফাটিয়ে হেসে নবাব বললো, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, অন্যরকম ! কলকাতার ট্রামে বাসে চড়াও তো কম কষ্টকর নয় ! আমি একবার দশ নম্বর বাসে চেপেছিলুম, উঃ, কি অবস্থা, মনে হচ্ছিল যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে—এই জন্যেই

তো কলকাতায় যাই না বেশী।

এত বড় একটা বিরাট প্রাসাদের মালিক, তরুণ নবাব কলকাতায় গিয়ে বাসে চড়বেন, এটা যেন ঠিক ভাবা যায় না। গাড়ি না থাক্, অন্তত ট্যাক্সি। আমি বললুম, আপনার নাম সেলজুক? পারস্যে যে বিখ্যাত সেলজুক বংশ ছিল, আপনারা কি তারই কোনো শাখা?

নবাব একটু অন্যমনস্কভাবে বললো, পারস্যেও সেলজুক বংশ ছিল বুঝি? কি জানি, আমি ইতিহাস-টিতিহাস তেমন পড়িনি। আমি ঠিক জানি না।

—আপনারা কি তাহলে মুর্শিদাবাদের নবাব বাড়ির···

—না, না, আমার বাবার দাদামশাই এমনি ছোট জমিদার ছিলেন! আমার বাবা পেয়েছিলেন দাদামশাইয়ের সম্পত্তি। চলুন, হাত মুখ ধুয়ে নেবেন। সকালে চা খান, না কফি?

—যে কোনো একটা—

এই সময় হঠাৎ একটা তীক্ষ্ম মেয়েলি গলার চিৎকার শুনতে পেলাম, কাশেম! কাশেম! আমার আতরদান কোথায়?

নবাব তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে ডাকলো, কাশেম! কাশেম! ওপরে যা—

কাশেম নামে কেউ সাড়া দিল না অবশ্য। সুবিমল আর আমি চোখাচোখি করলাম। আমার চোখে প্রশ্ন। সুবিমলের চোখে উত্তর নেই। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক মনে হলো। বনেদী খানদানী বাড়ির কোনো মেয়ের পক্ষে অত চিৎকার করে ডাকা ঠিক সহবৎ নয়। তা ছাড়া এই সকালবেলা আতর-দানেরই বা খোঁজ কেন? হয়তো মেয়েটি জানে না—বাড়িতে অতিথি এসেছে। কাশেম নামে যাকে ডাকা হচ্ছে, সে হয় আশেপাশে নেই অথবা সাড়া দিতে চায় না।

নবাব আবার ঘরে ঢুকে বললেন, চলুন, একটু চা-টা খেয়ে নেবেন। এখানে কিন্তু পাঁউরুটি পাওয়া যায় না। আপনাদের নিশ্চয়ই রোজ সকালে চায়ের সঙ্গে টোস্ট খাওয়া অভ্যেস!

সুবিমল বললো, আমাদের কি অভ্যেস না অভ্যেস তা নিয়ে আপনি কিছু ভাববেন না। আমাদের কোনো ধরাবাঁধা অভ্যেস নেই। আপনি যা ব্যবস্থা করবেন—

—আসুন, এদিকে আসুন।

সিঁড়িটাও বেশ অন্ধকার, দেওয়ালে বড় বড় ফাটল, সিনেমায় যেমন দেখি নবাব বাদশাদের বাড়িতে সিঁড়ির কাছে দেয়ালে ঢাল-তলোয়ার ঝোলানো থাকে —সে রকম কিছু এখানে নেই। দেয়ালের গায়ে পদ্মফুল ও লতাপাতার মোটিফ। হয়তো ছিল এককালে ঢাল তলোয়ার—বিক্রি হয়ে গেছে এখন।

দোতলায় উঠলে রীতিমতন ভয় করে। দোতলার ঘরের ছাদগুলোর অবস্থা

শোচনীয়, এক জায়গায় তো শালবল্লা দিয়ে ঠেকনা দিয়ে রাখা হয়েছে। বাড়িটাকে দেখলে মনে হয়—দু' একদিন আগেই এখানে দারুণ ভূমিকম্প হয়ে গেছে।

নবাবের সঙ্গে কি রকমভাবে কথা বলতে হবে, সে সম্পর্কে আমার মনে একটু অস্বস্তি ছিল। ভেবেছিলাম, হয়তো কিছু রীতি-নীতি মানতে হবে—কুর্নিশ করতে না হলেও সম্বোধন করতে হবে বোধহয় সম্ভ্রমের সঙ্গে। কিন্তু আমাদেরই বয়েসী একটি ছেলে, চালচলনের মধ্যে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। এমন কি, আব্বা, ফুফা, খালা—এ সমস্ত কথাও ব্যবহার করছে না অন্তত আমাদের সামনে। পানি না বলে জল বললো। কথায় মাঝে মাঝে দু' একটা ইংরেজি শব্দও থাকে, উচ্চারণ খুব স্পষ্ট। মোটামুটি আধুনিক যুবকই বলা যায়।

সুবিমল বললো, এতবড় বাড়ি, কোনোদিন বোধহয় সারানো-টারানো হয় নি, তাই না?

মেহদী আলি ক্ষীণ হেসে বললো, এই গোটা বাড়ি সারাতে যা খরচ পড়বে, সেই টাকায় আপনাদের কলকাতার পার্ক স্ট্রীটে একটা নতুন বাড়ি হতে পারে।

—কিন্তু আপনার ঘরের ছাদ তো যে-কোনোদিন ভেঙে পড়তে পারে?

—কবে ভেঙে পড়বে, সেই প্রতীক্ষাতেই তো আছি!

—তার মানে?

আবার সারা বাড়ি কাঁপিয়ে চিৎকার শোনা গেল, কাশেম! কাশেম! আমার আতরদান কোথায়?

খুব কাছ থেকেই আওয়াজ, তিনচারখানা ঘর পরে। মনে হয় যেন জানলার কাছে একটি মেয়ের নীলরঙা শাড়ির আঁচলও দেখতে পেলাম। কিন্তু মুখ দেখিনি।

মেহদী আলি সেদিকে এগিয়ে গিয়ে শান্ত গলায় বললো, জুলি, কাশেম এখানে নেই, আমিও খুঁজে দেখেছি।

—তুমি চুপ করো!

—জুলি, আমার কাছে দু'জন মেহমান এসেছেন!

—কাশেম কোথায়? কাশেম? আমি এখন বাইরে বেরুবো।

—কাশেম এলে আমি পাঠিয়ে দেবো।

—তুমি চুপ করো! কাশেম—

আমি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সুবিমলের মুখে মিটিমিটি হাসি। কোনো অবস্থাতেই অবাক হবে না, ওর এই রকম প্রতিজ্ঞা। মেহদী আলি আবার আমাদের কাছে এসে বললো, চলুন, আপনাদের শুধু শুধু দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

লম্বা বারান্দা পেরিয়ে এলাম অন্যপ্রান্তে। আসবার সময় আমি আড়চোখে সেই ঘরটার দিকে তাকিয়েছিলাম—যেখান থেকে চিৎকার আসছিল। এবারও মেয়েটির মুখ দেখতে পেলাম না। মেয়েটি তখন বাইরের দিকের জানলার

সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিল কাশেমের নাম ধরে। মনে হয় ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়েস মেয়েটির, শরীরের গড়ন সুন্দর—খুব দামি একটা শাড়ি পরে আছে।

খাবার ঘরে ঢুকে আর একবার বিস্ময়। টেবিলের ওপর তিনটে চেয়ারের সামনে অন্তত দশ বারোটি প্লেটে খাবার সাজানো। কোনোটায় লুচি, কোনোটায় রাবড়ি, কোনোটায় ফলের রস, ডিম. চীজ সব কিছুই। আমি স্বাভাবিকভাবেই বলে উঠলুম, একি, করছেন কি, এত খাবার ?

সুবিমল উৎফুল্লভাবে বললো, আমার অবশ্য আপত্তি নেই। নবাবী খানা যে একটু স্পেশাল হবে, জানতুমই !

আমি বললুম, তা বলে, এই সকালবেলা এত খাবার খাওয়া যায় ? সেলজুক সাহেব, আপনি কি রোজ এত খাবার খান ?

—আমাকে সেলজুক সাহেব বলবেন না। শুধু মেহদী বলে ডাকবেন। আমিও আপনাকে সুনীল বলবো।

—কিন্তু এত খাবার, আপনি রোজ খান।

—মানুষ রোজ যা খায়, অতিথিকেও তাই খেতে দিলে অতিথির অপমান করা হয় না !

—কিন্তু আপনি আমাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করলে—আমাদের লজ্জা লাগবে।

সুবিমল ততক্ষণে বসে পড়েছে। বললো, লজ্জা করলে মানুষ বেশী খায়। দেখবেন, সুনীল একটা কিছুও ফেলবে না।

দেখা গেল মেহদী আলি সাহেবী কেতাতেও অভ্যস্ত। চেয়ারে বসবার আগে বললো, আমার স্ত্রী এখন আসতে পারছেন না, সেজন্য তাঁকে ক্ষমা করবেন !

আমি বললুম, না, না, তাতে কি আছে !

মেহদী আলি আবার মৃদু স্বরে বললো, আপনারা হয়তো ভাবছেন, আমার স্ত্রী পাগল ! তা কিন্তু নয়। হঠাৎ হঠাৎ ও'র এই রকম মেজাজটা একটু বেশী খারাপ হয়ে যায়। আপনারা হয়তো অপমানিত মনে করছেন, কিন্তু আমি ও'র হয়ে মাপ চাইছি।

সুবিমল ব্যস্ত হয়ে উঠলো, আরে ছি ছি, ওসব কথা বলছেন কেন ? আমরাই এসেছি আপনাকে জ্বালাতন করতে।

—জ্বালাতন করতে কি বলছেন ! এইরকম গ্রামের মধ্যে পড়ে থাকি, শহর থেকে যদি কখনো বন্ধু-বান্ধব আসেন, আমার খুব ভালো লাগে ! আপনারা কিন্তু সাতদিনের মধ্যে ফিরতে পারবেন না !

আমি বললাম, সাতদিন ? অসম্ভব ! আমি মোটে তিনদিনের ছুটি নিয়ে এসেছি।

—ছুটি ? কিসের ছুটি ?

—বাঃ, আমাকে চাকরি করতে হয় না ? আমি তো আর সুবিমলের মতন

ব্যবসা করি না!

—আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আপনারা দুজনে পার্টনার।

—এক হিসেবে পার্টনারও বলতে পারেন। সুবিমল ব্যবসায় যা লাভ করে, সেটা খরচ করার ব্যাপারে আমি পার্টনার!

শব্দ করেই হাসলো মেহদী আলি, কিন্তু সেটা খুব স্বতঃস্ফূর্ত মনে হলো না। বোঝা যায়, তার মনটা চঞ্চল হয়ে গেছে। তবু কথা চালাবার জন্য বললো, যাই বলুন, সাতদিনের আগে আপনাদের ছাড়ছি না?

—এবার সত্যি থাকা হবে না, পরে না হয়—

—যাবার চেষ্টা করুন তো, জোর করে পাইক বরকন্দাজ দিয়ে আটকে রাখবো।

—পাইক বরকন্দাজ তো এ পর্যন্ত দেখলাম না একজনও!

তিনজনেই হাসতে লাগলাম। একজন লোক মেহদী আলির কানের কাছে এসে কথা বললেন। খুব আস্তে বললেও আমি শুনতে পেলাম, হুজুর, কাশেম এসেছে! মেহদী আলির ফর্সা মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠলো। মেহদী আলি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, কাশেম বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে?

লোকটি ফিসফিস করে বললো, দেউড়ি পেরিয়ে এসেছে।

—চাবুকটা নিয়ে যা! কাশেম যদি এমনি না যায়, চাবুক মেরে ওকে মেরে তাড়িয়ে দিবি!

লোকটি নিষ্ক্রান্ত হতেই মেহদী আলি আমাদের দিকে ফিরে বললো, কিছু মনে করবেন না! এমনিই সাধারণ একটা ব্যাপার।

সুবিমল ঠোঁট কাটা। মৃদু হেসে বললো, খুব সাধারণ নয়, তা বুঝতেই পারছি। কিন্তু আমাদের তা জানবার কৌতূহলও নেই।

মেহদী আলি সরু চোখে তাকালো একবার সুবিমলের দিকে। হয়তো এরকম মুখের ওপর উদ্ধত ভঙ্গিতে কথা শোনার অভ্যাস তার নেই। কিন্তু পরক্ষণেই সে সামলে নিয়ে বললো, আপনাদের আর কি দেবো বলুন? আর একটা করে ডিম দিই?

একজন পরিচারক দরজার আড়ালেই দাঁড়িয়েছিল, সেই মুহূর্তেই সে একটা ট্রে-তে করে তিনটে ডিম এনে হাজির করলো। মেহদী আলি সেই ডিমগুলোর দিকে হাত বাড়িয়ে কি একটা ভঙ্গি করতেই একটা ডিম লাফিয়ে তার হাতে উঠে এলো!

আমি আঁতকে উঠে এক পাশে সরে গিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলুম তার দিকে। সুবিমল কিন্তু নির্বিকার। ডিমটার খোলা ছাড়ানো নেই, মেহদী আলি সেটা কানের কাছে নিয়ে যেতেই সেটার ভেতর থেকে একটা মুর্গী ডেকে উঠলো। মেহদী আলি ডিমটা আলোর দিকে বাড়িয়ে বললে, নিন্, এটা বেশ ভালো হবে—

আমি তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। ডিমটা নেবো কি নেবো না ইতস্তত করছি। সুবিমল বললো, বাঃ, আপনি ম্যাজিকটা বেশ ভালোই শিখেছেন তো!

মেহদী আলি স্মিত হাস্যে বললো, আপনাকে তেমন ইমপ্রেস করতে পারিনি মনে হচ্ছে! সুনীলবাবু কিন্তু বেশ চমকে গিয়েছিলেন!

সুবিমল বললো, না চমকালে আর ম্যাজিক কি! আচ্ছা, আপনি এই গোটা টেবিলটা মাটি থেকে ওপরে উঠাতে পারেন? ওঠান্ তো!

মেহদী আলি অনর্গলভাবে হাসলো। বললো, ঐ একটা জিনিস হয় না। ম্যাজিসিয়ানদের কোনো একটা ব্যাপার দেখাবার জন্য হুকুম করলে তারা তো দেখায় না! হঠাৎ চমকে দেওয়াই ম্যাজিসিয়ানদের বৈশিষ্ট্য! ঐ দেখুন, আপনার বুক পকেটে একটা ডিম! ফেটে যাবে, ফেটে যাবে!

—অ্যাঁ! সুবিমল এবার সত্যি চমকে উঠলো। তাড়াতাড়ি বুক পকেটে হাত দিতেই একটা ডিম বেরিয়ে পড়লো।

মেহদী আলি আর আমি গলা মিলিয়ে হাসতে লাগলুম। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি কতদিন ধরে ম্যাজিক শিখছেন?

—দু'তিন বছর। এই শখ নিয়েই সময় কেটে যায়!

খাওয়ার পর আমরা গোটা বাড়িটা দেখতে বেরুলাম মেহদী আলির সঙ্গে। মাত্র সামান্য কিছুটা অংশই আস্ত রয়েছে, বাকি সবই ভাঙাচুরো। এ বাড়ির মধ্যে ঘুরতে বেশ ভয়-ভয়ই করে, কখন কোথায় কি মাথার ওপর ভেঙে পড়বে তার ঠিক কি? পেছন দিকের একটা দরজায় মেহদী আলির সেই অনুচরটি তখনও চাবুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে কেউ নেই অবশ্য। সেইদিকে আমি একবার তাকিয়ে দেখলাম, কাশেম নামের লোকটিকে দেখার কৌতূহল ছিল আমার।

সুবিমল এসেছে মেহদী আলির কাছ থেকে কিছু পুরোনো কালের জিনিস-পত্র কিনতে। আমি তার অকারণে সঙ্গী। কিন্তু সুবিমলের ভাবভঙ্গির মধ্যে এই সব জিনিসের ক্রেতা-সুলভ কোনো বিনয় নেই। ও কথা বলছে রীতিমতন সমান সমান সুরে থিয়েটার রোডের একটা কিউরিও শপে সুবিমলের সঙ্গে আলাপ মেহদী আলির, সেই থেকে প্রায় বন্ধুত্ব।

সুবিমল বললো, চলুন, এবার আপনার জিনিসপত্রগুলো দেখা যাক!

—দেখবেন, দেখবেন, এত ব্যস্ত কেন?

—কোথায় আছে সেগুলো?

—ঐ যে সাদা মসজিদটা দেখছেন, ওরই দু'খানা ঘরে রাখা আছে অনেক পুরোনো জিনিস। ওটা আমাদের পারিবারিক মসজিদ। সব জিনিসপত্র ভেঙে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—দেখা-শুনো করার কেউ নেই—চলুন। মসজিদটায় একটু ঘুরে

আসি।

—এখন গিয়ে এমনি মসজিদ দেখতে পারেন, কিন্তু জিনিসপত্র কিছুই দেখতে পাবেন না। ও ঘরের চাবি আছে মৌলবী সাহেবের কাছে—

—মৌলবী সাহেব এখানে নেই?

—আরে দাদা, এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এখানে কয়েকদিন থাকুন। আমাদের জায়গাটা দেখুন, জিনিসপত্র তো আছেই! কতদিন কথা বলার লোক পাই না! আমরা আবার শহরে গেলে ঠিক স্বস্তি পাই না! মৌলবী সাহেব গেছেন মুর্শিদাবাদ সদরে, পাকিস্তান থেকে ওঁর এক আত্মীয় এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে।

—কবে আসবেন?

—যদি বলি এক সপ্তাহ বাদে? হাঃ-হাঃ-হাঃ! না, না, কাল সকালেই আসবেন।

দুপুরে আবার সেইরকম বিরাট খাবারের আয়োজন। নবাব সাহেব এবারও আমাদের সঙ্গে খেতে বসলেন। পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরানো হয়েছে আমাদের জন্য, দু'রকম মাংস—পাঁঠা, মুর্গী, সেইরকম ছ'সাত রকমের মিষ্টি। জামাইরাও আজকাল এরকম আদর পায় না।

মেহদী আলি এবারও ভদ্রতা করে বললো, আমার স্ত্রী এখনও তৈরি হতে পারেন নি, তিনি আপনাদের খেতে বসাতে পারলেন না, এজন্য কিছু মনে করবেন না!

আমি শশব্যস্ত বলে উঠলুম, না, না, তাতে কি হয়েছে!

বনেদী মুসলমান পরিবারের বউ আমাদের সঙ্গে এসে একসঙ্গে খেতে বসবে, এটা আমরা আশাই করিনি। অনেক হিন্দু বাড়ির বৌরাও তো অতিথিদের সঙ্গে খেতে বসে না। এখন আর কাশেম কাশেম ডাক শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না, বারান্দা দিয়ে আসবার সময়েও জানলায় কারুকে দেখিনি।

মেহদী আলি আবার বললো, আমার আম্মা আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে চান। যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে।

আমি আর সুবিমল দুজনেই সসম্ভ্রমে বললুম, নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!

সুবিমল বিলিতি আদব-কায়দায় অভ্যস্ত, সে মেহদী আলির মাকে দেখে সম্মান করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

মেহদী আলির মায়ের বয়েস পঁয়তাল্লিশের বেশী না, এককালে অসাধারণ রূপসী ছিলেন, কিন্তু এখন চোখে-মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ। অত্যন্ত ঘরোয়া-ভাবে তিনি বললেন, বসো বাবা, বসো! তোমরা আমার ছেলের বয়সী, আমার ছেলেরই মতন—

মুসলমান মহিলাদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা দস্তুর কিনা আমাদের

জানা নেই। সুবিমল হাতজোড় করে নমস্কার করলো. আমি সেলামের ভঙ্গিতে একটা হাত কপালে তুললাম। আমাদের অনেকেরই ধারণা, বনেদী মুসলমান বাড়িতে বুঝি বাংলায় কথা বলা হয় না, কিন্তু এ বাড়িতে দেখছি বাংলাই একমাত্র ভাষা। মেহদী আলির মায়ের উচ্চারণ শুনে মনে হয়, কিছুটা লেখা-পড়াও শিখেছেন!

মা বললেন, বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করতে পারিনি, তোমাদের কষ্ট হবে খেতে।

বুঝলুম! এরই নাম নবাবী বিনয়। সুবিমল মৃদুহাস্যে বললো, হ্যাঁ, কষ্ট করেই এতগুলো খাবার খেতে হবে অবশ্য?

—সব একটু করে চেখে দেখতে হবে কিন্তু। না বললে শুনবো না! তোমরা এক হিসেবে আমার ছেলের কুটুমও তো বটে!

কুটুম কথাটা শুনে একটু অবাক হলুম। হয়তো মেহদী আলির মা বন্ধুর বদলে কুটুম বলে ফেলেছেন! মেহদী আলি লাজুকভাবে মুচকি মুচকি হাসছে। মা আবার বললেন, আমার বৌমা তো তোমাদের হিন্দু ঘরের মেয়ে! এই বাঁদরটা যখন বহরমপুরে পড়তে গিয়েছিল, তখন নিজে পছন্দ করে শাদী করেছে!

—আঃ আম্মা, ওসব কথা এখন থাক্!

মা বাধা না মেনে বললেন আমাদের দিকে তাকিয়ে, বাঁদর বললুম কেন জানো? বহরমপুরে মেহদী থাকতো বৌমাদের পাশের বাড়িতে। এমন বাঁদর ছেলে, পাশাপাশি ছাদ তো, এ ছাদ থেকে ও ছাদে লাফিয়ে বৌমার সঙ্গে গিয়ে ভাব করেছিল।

দুঃসাহসিক প্রেমের গল্প। অন্য কারুর সম্পর্কে শুনলে তেমন আশ্চর্য হতুম না। কিন্তু একজন তরুণ নবাবকে ছাদ লাফাবার ভূমিকায় ঠিক যেন মানানো যায় না। বস্তুত এ বাড়ির আর সব কিছুই সাধারণ মধ্যবিত্ত ধরনের, কিন্তু এই বিশাল ভাঙা প্রাসাদটার পটভূমিকাই সব কিছু যেন রহস্যময় করে দিয়েছে!

মা বললেন, খাও বাবা, তোমরা খেতে খেতে গল্প করো? আমি একটু গা ধুতে যাই।

মা চলে যাবার পর আমি মেহদী আলিকে জিজ্ঞেস করলুম, কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। আপনার কি একটিই স্ত্রী?

অট্টহাস্য করে মেহদী আলি বললো, আপনি কি আশা করেছিলেন, আমার এখানে একটা হারেম দেখতে পাবেন?

আমি অপ্রস্তুতভাবে বললুম, না, ঠিক তা নয়।

সুবিমল আমাকে বাঁচাবার জন্য বললো, আমি কিন্তু মশাই আপনার মতন অবস্থায় থাকলে অন্তত চারটে বিয়ে করতুমই!

মেহদী আলি বললো, আপনি জানেন না তাই? একজন হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেই···আপনাদের হিন্দুদের মেয়েরা···

সুবিমল বললো, সে আর আমাকে বলতে হবে না। আপনাকে একটুও হিংসে করছি না মশাই! আমি তো আর মুসলমান মেয়েদের সঙ্গে মেশার সুযোগ পাইনি! যে-কটা হিন্দু মেয়ের সঙ্গে মিশেছি, ওরে বাবা, একেবারে হাড়-জ্বালিয়ে দিতে পারে ওরা।

মেহদী আলি আমার দিকে ফিরে বললো, এ সম্পর্কে সুনীলবাবুর কি মত?

আমি গম্ভীরভাবে বললুম, আমার কাছে মেয়েদের কোন জাত নেই। মেয়েরা যদি জ্বালিয়েও মারে, তাহলেও আমার কাছে, 'সে মরণ স্বরগ সমান!'

সুবিমল বললো, সুনীলটা চিরকালের পাজী!

মেহদী আলি বললো, আমার স্ত্রী জুলেখা কিন্তু সত্যি খুব ভালো মেয়ে। মাঝে মাঝে শুধু ওর মেজাজটা একটু খারাপ হয়ে যায়।

—আপনার স্ত্রীর নাম আগে কি ছিল?

—জয়া সান্যাল?

—বামুনের মেয়ে?

—হ্যাঁ, একেবারে বামুনের জাত মেরে দিয়েছি! মেয়ের বাবা-মা কিন্তু নিজেরাই ব্যবস্থা করে আমাদের বিয়ে দিয়েছেন!

সুবিমল আলটপকা জিজ্ঞেস করে ফেললো, কাশেম কে?

মেহদী আলি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। থমথমে মুখে বললো, দয়া করে এ প্রসঙ্গটা তুলবেন না।

আমি সঙ্গে সঙ্গে সুবিমলকে চোখের ইশারায় বারণ করে বললাম। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এসব ব্যক্তিগত ব্যাপার···। আসলে আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কোনো কথা রাখা ঢাকা থাকে না, সুবিমল সেই হিসেবেই প্রশ্নটা মুখ ফসকে জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল।

আমাদের বিশ্রাম করতে দেওয়া হয়েছে একতলার একটি ঘরে। আরাম করে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শরীর ছড়িয়ে সুবিমল জিজ্ঞেস করলো, কেমন বুঝছিস?

আমি বললাম, ব্যাপারটা বেশ জমে উঠেছে, এসেছি দোকানদার হয়ে জিনিস-পত্র কিনতে. ভেবেছিলাম দরাদরি করার পর পোঁটলাপুঁটলি কাঁধে নিয়ে ফিরতে হবে, অথচ পাচ্ছি জামাই আদর! কি খাওয়া-দাওয়া মাইরি! সত্যি লজ্জা করছে।

—লজ্জা করলে পৃথিবীতে কিছু হয় না। যখন যা পাবি খেয়ে যাবি।

—কিন্তু আমাদের জন্য এত খরচ করছে। নবাবের তো অবস্থা মোটেই ভালো নয়। তোর কাছ থেকে আর কত টাকা পাবে?

—আরে, তবুও মরা হাতি লাখ টাকা। নবাবী কায়দা তো রাখতে হবে। রান্নাগুলো কিন্তু ফার্স্টক্লাস!

—তা হলে এখানেই ক'দিন থেকে যাওয়া যাক।

—মন্দ কি ! নবাবের আপত্তি হবে না মনে হয় ! মেহদী আলির মা কিন্তু খুব চমৎকার, দেখলে শ্রদ্ধা হয় !

—আচ্ছা, তোর কি ধারণা, নবাব ওর বৌকে একবারও আমাদের সামনে বার করবে ?

—দ্যাখ সুনীল, সব জায়গায় গল্প খোঁজার চেষ্টা করিস না !

—গল্প যদি আমার পেছন পেছন তাড়া করে, তাহলে আমি কি করতে পারি ? আমার তো মনে হচ্ছে, নবাবের স্ত্রীর মাথার দোষ আছে ।

—মোটেই না । তা হলে নবাবের মায়ের ব্যবহারে তা বোঝা যেত । উনি তো ছেলের বৌয়ের ওপর বেশ খুশীই মনে হলো ।

—তাহলে ঐ কাশেম নামের কে একটা লোককে চাবুক মেরে তাড়ানোর ব্যাপারটা কি ?

—আমার কি দরকার বাবা ! এসেছি পাথরের মূর্তি কিনতে, কি করে সস্তায় পাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করছি । তার ওপর বিনা পয়সায় এমন ভালো খাওয়া-দাওয়া পাওয়া যাচ্ছে— । ওসব কাশেম-টাশেমের ব্যাপার নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কি দরকার ?

এত বেশী খাওয়া হয়েছিল যে শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ জড়িয়ে আসছিল । দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যেস নেই কারুরই । সুবিমল আর আমি অনেকক্ষণ গল্প করতে করতে জেগে থাকার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কখন যে এক সময় দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই । এমনকি আমার জ্বলন্ত সিগারেটটা ঘুমন্ত হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল কার্পেটে । কি একটা গন্ধ পেতেই আবার ঘুম ভাঙলো, চোখ চেয়ে দেখি আমার জ্বলন্ত সিগারেটে কার্পেটের অনেকটা গোল হয়ে পুড়ছে । তাড়াতাড়ি হাতের থাবড়া দিয়ে নিভিয়ে দিলাম । ইস্ অনেকখানি পুড়ে গেছে কার্পেটটা, বেশ লজ্জা করতে লাগলো । যদিও, সেই কার্পেটটার আরও দু-এক জায়গায় ওরকম ছেঁড়া কিংবা পোড়া রয়েছে । নতুন পোড়া দাগ যাতে বুঝতে না পারা যায়, সেইজন্য আমি গড়িয়ে গিয়ে সেটার ওপর পিঠ দিয়ে শুলাম, এবং একটু বাদেই আবার ঘুমিয়ে পড়লাম ।

কি একটা আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙলো । চোখ মেলেই ভয় পেয়ে ধড়মড় করে জেগে উঠলাম । আমার চোখের ঠিক সোজাসুজি একটা জানলা, সেই জানলার বাইরে থেকে একটি মানুষের মুখ তীব্র দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে । একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের ছেলে, গালে সরু করে ছাঁটা দাড়ি, নাক চোখ বেশ তীক্ষ্ণ । যে হাতে সে জানলার শিকটা চেপে ধরে আছে, হাতখানা দেখলেই বোঝা যায় যে বেশ শক্তিশালী পুরুষ ।

আমাকে জাগতে দেখেই সে চোখের ইশারায় আমাকে কাছে ডাকলো । প্রথম ঘুম ভেঙেই ওরকম একটা মুখ দেখে বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল, একটু ঘুমের ঘোর কাটতেই বুঝতে পারলুম, একটা সাধারণ ছেলে, খানিকটা মিনতি

মাথা চোখেই আমাকে জানলার কাছে ডাকছে।

আমি উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি?

ছেলেটি ফিসফিস করে বললো, আপনাদের এই ঘরের ডানদিকে একটা দরজা আছে। সেই দরজাটা খুললে দেখবেন আর একটা ছোট ঘর। সেই ঘরে একটা দরজা আছে বাড়ির পেছন দিকের—সেই দরজাটা একটু খুলে দিন তো?

—কেন!

—আমি ভেতরে ঢুকবো।

—ভেতরে ঢুকবেন, তো সামনের গেট দিয়ে আসুন।

—সে গেট দিয়ে ঢুকতে হলে অনেক ঘুরে আসতে হবে। আপনি খুলে দিন না একটু কষ্ট করে—

—দেখুন, আমরা এ বাড়িতে অতিথি। আপনি বরং অন্যদের চেঁচিয়ে ডাকুন না।

সুবিমলেরও ঘুম ভেঙে গেছে। সেও উঠে এসে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার!

ছেলেটি সুবিমলের কাছে আরও বিনীতভাবে অনুরোধ করলো, দয়া করে, ডানদিকে ঘরের দরজাটা একটু খুলে দিন না! আমার একটু বিশেষ তাড়াতাড়ি আছে!

সুবিমলের উপস্থিত বুদ্ধি বেশী। আমিও বুঝতে পেরেছিলাম, সুবিমলও বুঝতে পেরেছে যে ঐ ছেলেটির নাম কাশেম। কিন্তু আমি ওকে ঢুকতে দেবো কি দেবো না—এ সম্পর্কে মনস্থির করতে পারছিলুম না। কিন্তু সুবিমল রীতিমতন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললো, আপনি এখানে ঢুকতে চান? কোন্ দিকে দরজা বললেন?

ছেলেটি অধীর অনুনয়ে বললো, মেহেরবানী করে একটু আস্তে, মানে ওপরে অনেকে ঘুমুচ্ছে। তাদের জাগাতে চাই না।

সুবিমল আবার সেই রকমই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি গোপনে ঢুকতে চান? আপনি কি এ বাড়ির লোক না বাইরের লোক।

—আমি এ বাড়িরই লোক।

—এ বাড়ির লোক হলে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকছেন না কেন? আপনার নাম কি?

সুবিমলের কৌশল বেশ কাজে লেগে গেল। ওর উঁচুগলায় কথা শুনে আকৃষ্ট হয়ে একজন লোক ঘরে উঁকি মেরেই জানলার ছেলেটিকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে এলো জানলার কাছে। এই সেই লোকটি, যাকে মেহদী আলি বলেছিল কাশেমকে চাবুক মেরে বিদায় করতে। লোকটি কিন্তু ছেলেটিকে তাড়া করলো না, কাছে এসে ব্যাকুলভাবে বললো, কাশেম, কাশেম, কি করছিস? নবাব সাহেব দারুণ রেগে আছে তোর ওপর।

কাশেমঠোঁট উল্টে বললো, রাগ করেছে তো তাতে আমলা হবে আমার। দে দরজা খুলে দে।

—না শিগগির দূর হয়ে যা।

—বশীর, যদি দরজা না খুলিস তো তোকে একদিন দেখে নেবো।

—যা, যা, পাগলামি করিস না! শিগগির পালা!

—বিবিজী আমায় ডেকেছিল, আমি শুনেছি। এই লোক দুটো কে?

—এরা সাহেবের দোস্ত। ঐ শোন সাহেব আসছে!

ওপরের সিঁড়ি দিয়ে সত্যি কারুর নেমে আসার আওয়াজ শোনা গেল। কাশেম টুপ করে বসে পড়লো জানলার নিচে, তারপর গুঁড়ি মেরে চলে গেল বাগানের দিকে।

—আমার ইচ্ছে ছিল, লোকটিকে কাশেম সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করবার। কিন্তু তার আগেই মেহদী আলি এসে ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢুকেই একবার তীক্ষ্ন চোখে তাকালো আমাদের দিকে, তারপর জিজ্ঞেস করলো, বশীর, তুই এখানে কি চাস্?

বশীর সঙ্গে সঙ্গে অম্লানবদনে উত্তর দিল, বাবুরা ডাকলেন আমাকে, পানি চাইলেন।

—পানি চেয়েছেন তো আনিস নি কেন এখনো!

বলার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে দু'গ্লাস জল এনে হাজির করলো। ঘুম থেকে উঠে জল খাওয়ার একটা ইচ্ছে থাকেই, আমরা দু'জনেই ঢকঢক করে জল খেয়ে ফেললাম। আমার মনে হলো, মেহদী আলি বুঝতে পেরেছে যে, একটু আগে এখানে কাশেম এসেছিল। হয়তো ওপর থেকে তাকে দেখতে পেয়েই নেমে এসেছে। কিন্তু সে-সব কথা কিছু উল্লেখ করলো না। সহাস্য মুখে জিজ্ঞেস করলো, ঘুমিয়ে উঠলেন বুঝি? কোনো অসুবিধে হয় নি তো?

আমরা দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলাম, না, না, অসুবিধে আর কি!

—মুখ হাত ধোবেন নিশ্চয়ই। ধুয়ে নিন তা হলে। চা তৈরি হচ্ছে।

আমি বললাম, কিন্তু শুনুন, চা খাবো এক শর্তে। চায়ের সঙ্গে আর কিছু না! দুপুরে যা খেয়েছি, এখনও পেট ভর্তি! তাছাড়া বিকেলে আমরা খালি চা খাই।

মেহদী আলির ঠোঁটে তখনও হাসি। বললো, জানি, কলকাতায় এখন এই সময়ে আপনারা তো চায়ের দোকানে এক কাপ চা নিয়ে গল্প করেন। আমারও খুব ইচ্ছে করে—

সুবিমল জিজ্ঞেস করলো, আপনি এই গ্রামে পড়ে থাকার বদলে কলকাতায় গিয়ে থাকেন না কেন?

—উপায় নেই। একদিন দু'দিনের বেশী কলকাতায় থাকতে পারি না।

—কেন?

—প্রথম কথা, কলকাতা আমার ঠিক সহ্য হয় না। কলকাতার খাবার কলকাতার জল খেলেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। তা ছাড়া, আমাদের এখানে জ্ঞাতিগুষ্ঠি অনেক, তাদের মধ্যে এত দলাদলি, এত ষড়যন্ত্র যে বেশীদিন এখানকার বাইরে থাকলে ফিরে এসে দেখবো হয়তো আমাকে আর এখানে ঢুকতেই দিচ্ছে না!

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। তাইতো এখানে একা একা পড়ে থাকতে হয়। কোনো কাজকর্ম নেই বিশেষ।

সুবিমল প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করলো, মৌলবী সাহেব এসেছেন? আসল জিনিসপত্রই তো এখনো দেখা হলো না!

—ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এখানে থাকতে ভালো লাগছে না?

—না, না, খুবই ভালো লাগছে। তবে—

—মৌলবী সাহেব আসবেন কাল সকালে। মৌলবী সাহেব এলেও, আপনার যে কাল ফিরতে পারবেন, সে আশা করবেন না।

—না, না, ফিরতেই হবে কাল।

—আকাশের অবস্থা দেখছেন? যদি সে-রকম বৃষ্টি নামে তিনদিনের মধ্যে ফেরার কোনো পথ থাকবে না।

—সে কি। কেন?

—মালপত্রগুলো অন্তত গরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যেতে হবে তো? খুব জোর বৃষ্টি হলে এমন কাদা হয় যে, তখন এ গ্রামের রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়িও চলে না।

—ধুৎ মশাই, আপনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন।

—ঠিক আছে, দেখবেন! আমি তো আর আপনাদের জোর করে আটকে রাখবো না।

—আচ্ছা, সে যা হয়, দেখা যাবে! এখন বিকেলটা কি করা যায়? চলুন একটু গ্রামটা ঘুরে দেখে আসি।

মেহদী আলির মুখটা হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললো, গ্রাম দেখতে যাবেন? যান তা হলে, আমি সঙ্গে একজন লোক দিচ্ছি!

—আপনি যাবেন না?

—আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের বংশে কেউ কখনো পায়ে হেঁটে এ গ্রামের রাস্তা দিয়ে ঘোরে নি। আমাদের বাড়ির শেষ ঘোড়াটা মারা গেছে দেড় বছর আগে!

আপনি এখনো এসব বুর্জোয়া ব্যাপার মানেন? এক সময় ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতেন, এখন ঘোড়া নেই বলে বাড়িতে বসে থাকবেন?

—আমি মানতে না চাইলেও গ্রামের লোক মানবেই। তারা আমাকে দেখলে

অবাক হবে, কথা না বলে দূরে সরে যাবে!

—আজকাল তো অনেক বড়ো বড়ো নবাব, রাজা-মহারাজা ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে, তারাও ভোট চাইবার জন্য পায়ে হেঁটে ঘুরছে।

—আমি তো কখনো ইলেকশনে দাঁড়াবো না।

আমি বললুম, ঠিক আছে সঙ্গে লোক দেবার দরকার নেই। আমরা নিজেরাই একটু ঘুরে আসি। হারিয়ে তো আর যাবো না।

মেহদী আলি বললো, হারালেও এ-বাড়ির গম্বুজ অনেক দূর থেকে দেখতে পাবেন। তাড়াতাড়িই ফিরে আসবেন তা হলে। আমি অপেক্ষা করবো আপনাদের জন্য।

সুবিমল আর আমি বেরিয়ে পড়লাম। সুবিমল বা আমার তেমন তীব্র পল্লীপ্রীতি নেই অবশ্য, তাছাড়া রাস্তাঘাট এখনো কাদায় চটচটে হয়ে আছে। কিন্তু সন্ধেটা কাটাবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো! আমরা সঙ্গে করে কলকাতা থেকে আনতে ভুলে গেছি, দেখতে হবে এ-গ্রামে কোথাও মালপত্র পাওয়া যায় কি না। এত ভালো ভালো জিনিস খাওয়া হচ্ছে, এর সঙ্গে একটু মদ্যপান না হলে হজম হবে কেন? নবাবকে তো আর মুখ ফুটে সে কথা বলা যাবে না!

সুবিমল আর আমি সেই সন্ধানেই বেরিয়ে পড়লাম। খানিকটা ঘুরতেই বুঝতে পারলাম ও সব পাবার কোনো আশা নেই। মুসলমান প্রধান গ্রাম, সকলেই প্রায় দারুণ গরীব, হাস-মুর্গী-গরু মানুষ জল কাদায় মিশে একসঙ্গে রয়েছে, গ্রামের একটি শিশুর স্বাস্থ্য ভালো নয়, একটি নারীর শরীরে কোমলশ্রী নেই, বৃদ্ধদের চেহারা জীবিত প্রেতের মতন। সুবিমল আর আমি চোখাচোখি করলাম, গ্রামের অবস্থা খারাপ আমরা জানতাম। এত খারাপ ভাবিনি। অবশ্য, বর্ধমান বা হুগলীর চেয়ে মুর্শিদাবাদের গ্রামের চেহারা আরও দুর্দশাগ্রস্ত, গোটা জেলায় সে-রকম কোনো ইণ্ডাস্ট্রি নেই, জঅবলম্বন মাত্র মি—তাও এ জেলায় সেচের কাজ প্রায় কিছুই হয়নি। দু'চার ঘর হিন্দুও রয়েছে, তারা অধিকাংশই জেলে আর তাঁতী তাদের অবস্থাও খারাপ—যদিও গ্রামের সবচেয়ে বড় মনোহারী দোকানটির মালিক একজন মাড়োয়ারী। একমাত্র সেই দোকানেই আমাদের ব্যবহারযোগ্য সিগারেট পাওয়া গেল।

এই গ্রামে মেহদী আলিদের প্রাসাদটি সত্যিই বিসদৃশ। গোটা গ্রামে খুঁজলে আট দশটার বেশী পাকা বাড়ি চোখে পড়ে না—তাও সামান্য ধরনের একতলা বাড়ি, এই গ্রামে অত বড় প্রাসাদ তৈরি হয়েছিল কি করে?

গ্রামটায় ঘুরে আমাদের একটু মন খারাপ হয়ে গেল। আমরা রাজনীতি কিংবা সমাজসেবা করতে আসিনি, কিন্তু চোখের সামনে এত মানুষের দীন-হীন চেহারা দেখলে মনটা মুষড়ে যায়। এই রকম একটা জায়গায় এসে আমরা পনেরো ষোলো রকমের পদ দিয়ে আহার সারছি। এটা নিশ্চয় অন্যায়। এখানে আর থাকার কোনো মানে হয় না।

গ্রামের লোক আমাদের দিকে সরু চোখে তাকিয়ে দেখছে। আমাদের পোশাক চালচলন দেখলেই বোঝা যায় আমরা এখানে নবাগত। বোধহয় আমাদের মতন কেউ এখানে সচরাচর আসে না। আমাদের অবস্থা অনেকটা সিনেমা স্টারদের মতন, যে-পথ দিয়েই যাচ্ছি, লোকে চোখ তুলে অনুসরণ করছে আমাদের। বাড়ির ভেতর থেকে বাচ্চা ছেলেরা দরজার কাছে ছুটে আসছে আমাদের দেখার জন্য। বোধহয় তারা পরস্পর বলাবলি করছে, ঐ দ্যাখ, ঐ দ্যাখ দুটো লোক, ওদের কি চমৎকার জামা কাপড়, ওরা চারবেলা পেটপুরে খেতে পায়—ওদের কি সুন্দর স্বাস্থ্য। হয়তো ঐ শিশুদের চোখে আমরা চিড়িয়াখানার নতুন কোনো প্রাণী।

সুবিমল বললো, চল্ এবার ফেরা যাক্! বিনা বাক্যব্যয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালাম! এর চেয়ে চুপচাপ ঐ ভাঙা বাড়ির মধ্যে গিয়ে বসে থাকাও ভালো।

যাবার সময় লক্ষ্য করিনি, ফেরার সময় দেখলুম একজায়গায় রাস্তা থেকে নেমে মাঠের ধারে একটা হোগলার ঘর, সেখানে মাটিতেই উবু হয়ে বসে আছে পনেরো কুড়িজন লোক, কি যেন খাচ্ছে। বুঝে নিতে আমাদের দেরি হলো না, ওটা তাড়ির দোকান। একজন লোক শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে কি যেন বোঝাচ্ছে। আমাদের দেখে সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে একবার না একবার তাকালো, শুধু সেই দণ্ডায়মান লোকটি কথা থামিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আমাদের দিকে।

আমি প্রথম চিনতে পারিনি,। সুবিমলই ফিসফিস করে বললো, এই সেই কাশেম।

আমার বুকটা একবার কেঁপে উঠলো ভয়ে। দুপুরবেলা কাশেমকে আমরা দরজা খুলে দিইনি। আমাদের ওপর রেগে আছে কাশেম। যদি এই লোকগুলোকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। আমার শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরা সতর্ক হয়ে উঠলো।

কাশেম এগিয়ে এসে একটু উদ্ধতভাবে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

সুবিমল কিন্তু একটুও বিচলিত হয়নি, সিগারেট টানতে টানতে অবহেলার সঙ্গে বললো, কলকাতা থেকে। কেন?

—এমনিই জিজ্ঞেস করছি।

—কেন, রাস্তা দিয়ে যে-কেউ হাঁটলেই আপনি এসে এরকম জিজ্ঞেস করেন নাকি?

—কেন, জিজ্ঞেস করাটা কি দোষের হয়েছে নাকি?

—আগে উত্তর দিন, সবাইকে এরকম জিজ্ঞেস করেন কিনা?

সুবিমলের গলার আওয়াজে এমন একটা কঠিন ভাব ছিল যে, তাতেই বোধহয় কাশেম খানিকটা নরম হয়ে গেল। সুবিমল ওর চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে

তাকিয়ে ছিল, কাশেমই প্রথম চোখ নামালো। এবার একটু নম্রভাবে বললো, না, এ সব পাড়াগাঁয়ে তো আপনাদের মতন লোক বেশী আসে না।

সুবিমল ফের একই রকম গলার আওয়াজে বললো, আপনি তো ভালো করেই জানেন, আমরা কোথায় এসেছি।

—হ্যাঁ, আপনারা ঐ ভাঙা বাড়িতে এসেছেন। আপনারা কি মেহদী আলির বন্ধু ?

হঠাৎ আমার মনে হলো, কাশেম ছেলেটা বোধহয় তেমন খারাপ নয়। একটু তেরিয়া একরোখা ধরনের, কিন্তু সৎ। ঐ বয়েসের ছেলেদের উদ্ধত হলেই মানায়। সুবিমল ওকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে। লক্ষ্য করলাম, কাশেম নবাববাড়ি না বলে বললো ভাঙা বাড়ি। আমি একটু নরমভাবে বললাম, না, আমরা নবাবের ঠিক বন্ধু নই, এমনি চেনা। আপনি দুপুরে ওবাড়িতে ঢুকতে গিয়েছিলেন কেন ? আপনাকে যখন ওরা নবাববাড়িতে ঢুকতে দিতে চায় না।

কাশেম বললো, ওটা আমারও বাড়ি। আমারও ওবাড়িতে ভাগ আছে।

—আপনিও নবাববাড়ির ছেলে ?

আমি বলতে চাইছিলাম, আপনিও নবাব বাড়ির ছেলে, অথচ তাড়ির দোকানে এসে দাঁড়িয়েছেন ? কিন্তু শেষের অংশটা আর উচ্চারণ করলাম না। কিন্তু কাশেম আমার ভঙ্গিটা বোধহয় বুঝতে পারলো। খানিকটা ব্যঙ্গের সুরে বললো, নবাববাড়ি, নবাববাড়ি বলছেন কেন ? নবাবার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ওটা তো সামান্য একটা গেঁয়ো জমিদারের বাড়ি, তাও এককালে ছিল, এখন আর জমিদারও নেই। ফাঁকা কাপ্তেন।

—তা হলে আসল মালিক কে ? আপনি না মেহদী আলি ?

—মালিক ঐ মেহদীই। কিন্তু আমি ওর নানীর ছেলে, আমারও ভাগ আছে। মেহদী আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—ন্যায্য ভাগ থাকলে তাড়াবে কি করে ?

কাশেম আবার দপ্ করে জ্বলে উঠলো। একটু চেঁচিয়ে বললো, মেহদীকে বলে দেবেন, আমাকে সে কি করে আটকায় আমি দেখে নেবো! এখনও সে কাশেমকে চেনে না—

কাশেমের উঁচু গলা সুবিমলের পছন্দ হলো না। রীতিমতন ধমকে ও বললো, এসব কথা আমাদের বলছেন কেন? আমরা বাইরের লোক, এসব শুনে কি করবো ?

—আপনারাই তো জিজ্ঞেস করলেন!

—মোটেই জিজ্ঞেস করিনি। আপনাদের ঝগড়ার কথা আমাদের শুনে কি লাভ ? আমরা এসেছি নিজেদের কাজে।

—কি কাজে ?

—তা দিয়ে আপনার দরকার ? কাজটা আপনার সঙ্গে নয়।

কাশেম তীব্র চোখে তাকালো সুবিমলের দিকে। কিন্তু সুবিমলের ঠাণ্ডা দৃষ্টি আরও কঠিন। কাশেম হার মেনে গেল। বললো, ঠিক আছে। আপনারা যদি এ গ্রাম থেকে কোনো জিনিস নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন, তখন আমি দেখাবো।

সুবিমল হা-হা করে হাসতে হাসতে বললো, মনে হচ্ছে আপনিই এ গ্রামটার মালিক? কেউ কোনো জিনিস কিনতে চাইলেও আপনাকে জিজ্ঞেস করে কিনতে হবে?

ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে যাচ্ছে দেখে, আমি দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললাম, আরে ঠিক আছে, ঠিক আছে? কথা বেশী বললেই কথা বাড়ে। চলু সুবিমল—

তারপর কাশেমের বাহু ছুঁয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে তো আমাদের কোনো ঝগড়া নেই ভাই। আপনার সঙ্গে মেহদী আলির কি ঝগড়া তা আপনারা বুঝবেন। আমাদের জড়াচ্ছেন কেন? চলি, অ্যাঁ?

একটু দূরে গিয়ে আমি সুবিমলকে বললাম, কাশেমকে যে অতটা চটিয়ে রাগালি, সেটা কি ভালো হলো? যদি মালপত্র নিয়ে যাবার সময় মাঝপথে গরুর গাড়ি থামায়?

সুবিমল হাসতে হাসতে বললো, তুইও যেমন! আমি দেখছিলাম আমার ব্যবসার স্বার্থ। তাই ওকে যাচাই করে নিচ্ছিলাম।

—কি যাচাই করছিলি?

—ঐ যে ও বললো, ও বাড়িতে ওরও শেয়ার আছে, তাই দেখে নিলাম সেটা কতটা সত্যি। কোনো জিনিস-টিনিস কিনতে গেলে ওরও অনুমতি দরকার হয় কিনা। কিন্তু ওর গলার আওয়াজেই বুঝেছি, ওর কিছু শেয়ার থাকলেও খুব সামান্য। ছেলেটা এমনিই লম্বা চওড়া বাত ঝাড়ে।

—সুবিমল, তোর সাহস আছে মাইরি!

—নতুন জায়গায় এলে কক্ষনো মিনমিন করতে নেই। প্রথমেই আপার হ্যাণ্ড নিয়ে নিতে হয়।

—আমি তোকে বলে রাখলাম সুবিমল, কাশেম আমাদের ওপর বেশ রেগে আছে। ও আবার আসবে, সহজে ছাড়বে না!

সুবিমল বেশ খুশী মনে বললো, আমিও ওকে সহজে ছাড়বো না।

আমাদের অপেক্ষায় বাড়ির সামনের প্রধান চত্বরটায় দাঁড়িয়ে ছিল মেহদী আলি। ব্যস্ত হয়ে পায়চারি করছিল। আমাদের দেখে বললো, ভাবলাম, শেষ পর্যন্ত আপনারা বোধহয় রাস্তা হারিয়েই ফেললেন!

সুবিমল শুকনো মুখে বললো, নাঃ। ছোট্ট গ্রাম, রাস্তা তো মোটে একটা, এর আবার হারাবো কি?

সুবিমলের হঠাৎ নিরুৎসাহ ভাবের কারণ বুঝতে আমার অসুবিধে হলো না। মোটে সাড়ে-ছ'টা সাতটা বাজে, সামনে একটা দীর্ঘ সন্ধে পড়ে আছে। এই সন্ধেটা কাটাবার চিন্তা করছে সুবিমল। রাত এগারোটার আগে কোনোদিন ঘুমুনো অভ্যেস নেই আমাদের, কলকাতায় এতক্ষণে বন্ধুরা মিলে হুল্লোড় শুরু করতাম, এখানে এই নির্জন পাড়াগাঁয়ে এর মধ্যেই আমরা দু'জনে হাঁপিয়ে উঠেছি। মাল-ফালও পাওয়া গেল না! মেহদী আলি ছেলেটা ভালো, কিন্তু কতক্ষণ আর তার সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগবে!

আবার সেই ভাঙাচুরো পথ দিয়ে ভেতরে ঢোকা। আমি একটা দেয়ালে যেই হাত রেখেছি, অমনি হুড়মুড় করে কয়েকটা ইঁট ভেঙে পড়লো। ইঁটগুলো আমার গায়েও পড়তে পারতো, কিন্তু ভয় পাবার বদলে আমি লজ্জিত হয়ে উঠলাম। আমারই জন্য তো বাড়িটা আরও একটু ভেঙে গেল! মেহদী আলি একেবারে হা-হা করে উঠলো। বললো, দেখবেন, দেখবেন, সাবধান! ইস্, আপনার গায়ে লাগে নি তো?

—না, না—

মেহদী আলি ক্রুদ্ধ চোখে দেয়ালটার দিকে তাকালো। আপন মনে বললো, এই দেয়ালটা এখানে থাকার দরকার কি?

তারপর সে সামসনের মতন উন্মত্তভাবে দেয়ালটা ভাঙতে লাগলো। তার প্রচণ্ড ধাক্কায় ঝরঝর করে খসে পড়তে লাগলো ইঁট সুরকি। আমি অনুভব করলুম, মেহদী আলির গায়ে প্রচণ্ড শক্তি আছে। নিছক দুধ ঘি খাওয়া নবাব সে নয়।

সুবিমল বললো, একি, একি করছেন কি?

মুখ না ফিরিয়ে মেহদী আলি বললো, ভেঙে ফেলছি দেয়ালটা।

—নিজেই নিজের বাড়ি ভাঙছেন। ছেড়ে দিন।

মেহদী আলির হঠাৎ ওরকম উত্তেজনার কোনো কারণ আমি বুঝতে পারলাম না। সুবিমল জোর করে ওর হাত না ধরলে ও বোধ হয় থামতো না।

বাকি পথটা চুপচাপ হেঁটে এলাম। অন্দরমহলে মেহদী আলি জিজ্ঞেস করলো, এখন কি করবেন?

সুবিমল নিরাসক্তভাবে বললো, আপনিই বলুন!

—আসুন, সুনীলবাবুর সঙ্গে একটু সাহিত্য আলোচনা করা যাক্? উনি তো লেখেন-টেখেন শুনেছি!

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তাও শুনেছেন? কিন্তু আমি ঐ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে একদম ভালোবাসি না!

—তবে কি নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসেন?

আমি বিন্দুমাত্র চিন্তাও না করে বললাম, যা নিয়ে আলোচনা করতে সবাই ভালোবাসে॥

· সেটা কি বিষয় ?

—নারী।

মেহদী আলিও অনুচ্চ গলায় হাসলো। বললো, আমি আবার ও সাবজেক্টটায় একদম কাঁচা! আলি, একটা প্রস্তাব করলো। চলুন, ছাদে বসে এমনিই একটু গল্প করা যাক্! আর ইয়ে, মানে, আপনারা কি হুইস্কি খান? আমার কাছে খানিকটা হুইস্কি আছে—

সুবিমল স্থান-কাল ভুলে গিয়ে মেহদী আলির পিঠে বিরাট এক চাপড় মেরে বললো, আগে বলবেন তো! আপনি মশাই সত্যি গুরুদেব লোক! এখন একটু হুইস্কি না হলে--

আর যাই হোক, মেহদী আলির পিঠে চাপড় দিয়ে কেউ কথা বলে না। এসব তার অভ্যেস নেই। সে একটু আড়ষ্টভাবে সরে দাঁড়ালো। মুখখানা তার লাল হয়ে গেল। কিন্তু নিজেকে সে। সামলাবার চেষ্টা করছে। একটা জিনিস আমি সকাল থেকেই লক্ষ্য করেছি, মেহদী আলি আমাদের সঙ্গে খুব সহজভাবে মেশবার চেষ্টা করছে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের দু'একটা ব্যবহার সে ঠিক মানিয়ে নিতে পারছে না। তখন তার নবাবী মর্যাদাবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তবুও অবশ্য সে রেগে উঠছে না, প্রাণপণে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছে। সুবিমলটার একদম কান্ডজ্ঞান নেই কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয়, খেয়াল থাকে না।

আমি একটু গুরুত্ব দিয়ে বললাম, তা হলে নবাব সাহেব, চলুন, ছাদে গিয়েই বসা যাক্।

মেহদী আলি এবারও নিজেকে সংযত করে নিল। ম্লানভাবে হেসে বললো, আমি নবাব সাহেব নই। আমি এমনই একজন সাধারণ মানুষ। চলুন যাওয়া যাক্। সিঁড়িটা কিন্তু ভাঙা, আপনাদের খুব সাবধানে যেতে হবে কিন্তু।

৮

বিকেলবেলা ঘন কালো মেঘ করে এসেছিল, এখন আকাশের একটা অংশ পরিষ্কার, দিব্যি কটকটে জ্যোৎস্না উঠেছে। হাওয়া দিচ্ছে ফুরফুরে। মনে হচ্ছে আমরা একটা কবরখানার বসে আছি। চতুর্দিকে ভাঙা বাড়ির ভগ্নস্তূপ। যে ছাদটায় আমরা বসে আছি, তারও পাঁচিল অনেক জায়গায় ভাঙা। যে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেছি, সেটার অবস্থা এমন শোচনীয় যে সেটা দিয়ে যদি আবার ঠিকঠাক নামতে পারি, তবে নিতান্ত সৌভাগ্য বলতে হবে।

মেহদী আলি মদ খায় একেবারে জলের মতন। এক এক গ্লাস ঢালছে আর এক চুমুকে শেষ করছে। নাটক ফাটকে দেখা যায়, আগেকার নবাবরা সিরাজী না কি একটা মদ খুব খেতো ঢক্‌ঢক্ করে, মেহদী আলি তার পূর্বপুরুষদের এই গুণটা পেয়েছে। সুবিমল আমাদের বন্ধুমহলে 'তিমি মাছ' নামে প্রসিদ্ধ। এক আধবোতল হুইস্কি তার কাছে কিছুই নয়! সে পর্যন্ত মেহদী আলির

খাওয়ার বহর দেখে চমকে গেল। তারপর সুবিমল পাল্লা দিতে গেল তার সঙ্গে।

আমার বুঝতে দেরি হলো না, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ওরা দু'জনই মাটিতে গড়াবে। অনেকেরই তো অনেক বারফাট্টাই দেখেছি। ওদের সঙ্গে অজ্ঞান হবার ইচ্ছে আমার একটুও নেই। আমি অল্প অল্প ঢেলে আস্তে আস্তে চুক্ চুক্ করে খেতে লাগলাম। এক সময় সুবিমল আব মেহদী আলি কি একটা বিষয় নিয়ে তর্কে খুব জমে গেলে, আমি গ্লাসটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ঘুরে দেখতে লাগলাম সারা ছাদটা।

একেবারে উপবের দিকে যেতে ভয় করে। অধিকাংশ জায়গাতেই পাঁচিল ভাঙা। তা ছাড়া যে কোনো জায়গায় পা দিলেই ইঁট খসে পড়তে পারে। যেদিকটার পাঁচিলটা মোটামুটি অক্ষত, সেখানে সাবধানে দাঁড়ালাম।

ইলেকট্রিক নেই এই গ্রামে, আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যেও আসবে কিনা সন্দেহ। চারদিকে জমাট অন্ধকার, জ্যোৎস্নার আলো তার সামান্যই ভেদ করতে পেরেছে। তবু আন্দাজে বোঝা গেল, এপাশে বাড়ির কাছেই একটা পুকুর। সেখানে একটা লণ্ঠনেব আলো আমি চোখ সরু কবে লণ্ঠনটার দিকে তাকিয়ে থাকতেই বুঝতে পারলাম, সেই লণ্ঠনটা ধরে আছে একটি মেয়েলি হাত।

আস্তে আস্তে অন্ধকার আমার চোখে সয়ে গেল লণ্ঠনের আগে মাঝে মাঝে আমি মেয়েটিকে দেখতে পেলাম। যে কেউ অনায়াসেই ভাবতে পারে, এখানে ঐ পুকুর পাড়ে একটি অলৌকিক অশরীরী মূর্তি ঘুরছে। কেননা লণ্ঠনের আলোয় একবার তার মুখ দেখা যায়, একবার সে অদৃশ্য। তাছাড়া, মেয়েটি পুকুরের জলে নামেনি, তাকে দেখলে মনে হয়, সে যেন পুকুর পাড়ে কি খুঁজছে। কোনো গাছের শেকড়?

মাঝে মাঝে মেয়েটিকে যেটুকু দেখতে পেলাম তাতে মনে হলো, মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী, একুশ-বাইশ বছরের বেশী বয়েস নয়, একটা কালো ওড়না মাথায় দিয়ে আছে। আমি চোখ দুটোকে যতদূর সম্ভব উজ্জ্বল করে মেয়েটিকে দেখার চেষ্টা করলুম। এই ভাঙা বাড়ি দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম, একটা কিছু সুন্দর জ্যান্ত জিনিস দেখার জন্য মন ছটফট করছিল।

এই কি জুলেখা। মেহদী আলির বউ? কিন্তু পুকুর ধারে সে কি করছে? বনেদী পরিবারের বউ একা একা রাত্তিরবেলা পুকুর ধারে ঘুরবে, এটা ঠিক আশা করা যায় না। কিন্তু তা ছাড়া আর কেই বা হবে। এত বড় বাড়িটায় আর তো কোনো জনমনুষ্য নেই। মেয়েটিকে দেখে খুব সাধারণ ঘরের মেয়েও মনে হয় না।

মেয়েটি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছে? খুব সম্ভবত নয়। তবু একবার সে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে হাতের লণ্ঠনটা উঁচু করলো। এবার আমি স্পষ্ট দেখতে

পেলাম তার গন্ধরাজ ফুলের মতন তাজা মুখ। চোখ দুটো টানা টানা। হঠাৎ আমি সচেতন হয়ে গেলাম, মেয়েটি আমাকেই দেখছে। হাত তুলে কি যেন বলার চেষ্টা করলো। আমি বুঝতে পারলাম না, আমার সরে যাওয়া উচিত কিনা। কিন্তু একটু বাদেই মেয়েটি লণ্ঠনটা সরিয়ে নিল। পাঁচিলের ওপর বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকেও আমি মেয়েটিকে কিংবা লণ্ঠনটা আর দেখতে পেলাম না।

গেলাসের অবশিষ্ট পানীয় এক ঢোকে শেষ করে আমি ফিরে এলাম ওদের কাছে। মেহদী আলি আর সুবিমল তখন তর্ক থামিয়েছে। মেহদী আলি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, কেমন দেখলেন মেয়েটিকে?

আমি চমকে ওঠার বদলে ভয় পেয়ে গেলাম। কিংবা ঠিক ভয় নয়। এই ধরনের অনুভূতিকেই ইংরাজীতে বলে, আনক্যানি। আমি বললাম, আপনি কি করে জানলেন?

মেহদী আলি সরলভাবে হেসে বললো, আমি যে ম্যাজিসিয়ান। আমি অনেক কিছু বলতে পারি। আপনি বুঝি ভাবছিলেন ও আমার বউ?

—তবে কে মেয়েটি?

—মৌলবী সাহেবের মেয়ে, সোফিয়া।

—মেয়েটি কিন্তু দারুণ সুন্দরী!

—লোকে তাই বলে। আপনিও বললেন।

সুবিমল ঈষৎ জড়িত গলায় বললে, সুনীলটা ঠিক এর মধ্যেই একটা মেয়ে খুঁজে বার করেছে!

আমি সুবিমলকে অগ্রাহ্য করে মেহদী আলিকে বললুম, মেয়েটিকে দেখে মনে হলো, ও যেন কি খুঁজছে।

—ঠিক! আমাকে খুঁজছিল।

—আপনাকে?

মেহদী আলি আবার হাসলো। মাতালের হাসি। বললো, সুনীলবাবু, এবার আপনার ফেভারিট সাবজেক্ট পেয়ে গেছেন! নারী! আমি আবার ও সম্পর্কে কথা বলতে একদম ভালোবাসি না! সুতরাং, ঐ সাবজেক্টের এখানেই ইতি!

—ঠিক আছে। আপনি দু' একটা ম্যাজিক দেখান!

—ম্যাজিক দেখবেন? এই দেখুন!

মেহদী আলি একটা ভর্তি গ্লাস ঠোঁটের সামনে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে দিল। তারপর গলা একটুও না কাঁপিয়ে বললো, দেখলেন তো, ভর্তি গ্লাসটা কি রকম খালি হয়ে গেল? এটা ম্যাজিক নয়?

—ঠিক আছে। এবার খালি গ্লাসটা এমনি এমনি ভর্তি করে দিন তো!

—তাও পারি। এই দেখুন।

গ্লাসটার ওপরে একবার, আমার চোখের সামনে একবার জাদুর ভঙ্গিতে হাত নাড়লো। আমি দেখলাম, সত্যি সত্যি গ্লাসটা আবার ভরে গেল। মেহদী আলি গ্লাসটা আবার ঠোঁটের কাছে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করলো। তারপর গ্লাসটা উপুড় করে বললো, দেখলেন তো, এতে আর এক ফোঁটাও নেই। এই দেখুন। এবার?

গ্লাসটা আবার সোজা করতেই সেটা টলটলে ভরা। একটু নাড়লেই যেন উপছে পড়বে। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। পি সি সরকারের ওয়াটার অব ইণ্ডিয়া নামের ম্যাজিক দেখে এক সময় খুব বিস্মিত হয়েছিলুম, কিন্তু চাঁদের আলোর নিচে বসে সেই ভাঙা প্রাসাদের ছাদে মেহদী আলির ম্যাজিক আমার কাছে আরও বিস্ময়কর মনে হলো। ও কি আমাকে সম্মোহিত করেছে? কিন্তু আমি আর সবই তো ঠিকঠাক দেখছি।

মেহদী আলি বললো, এই দেখুন, আর একটা! হাতের খালি গ্লাসটা মেহদী আলি মেঝের উপর ছুঁড়ে মারলো। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল সেটা। পরমুহূর্তেই জাদুর একটা ভঙ্গি করে ভাঙা কাচগুলো কুড়োতে গিয়ে মেহদী আলি একটা আস্ত গ্লাস তুলে আনলো। ভাঙা কাচের চিহ্নমাত্র নেই সেখানে। সুবিমল বললো, হ্যাট্‌স অফ্। সত্যি মশাই ম্যাজিকের মতন ম্যাজিক। এবার আমার ফাঁকা গ্লাসটা ভরে দিন তো।

মেহদী আলি বললো, আর হবে না। আমার শক্তি চলে গেছে।

আমি বললাম আপনি এরকম ভাঙা জিনিস ইচ্ছে করলেই জুড়তে পারেন? খালি জিনিস ভরে দিতে পারেন?

খানিকটা তেজের সঙ্গে মেহদী আলি বললো, হ্যাঁ পারি।

—তা হলে আপনাদের এই ভাঙা বাড়িটাও আপনি ম্যাজিকে সুন্দর করে দিন না।

মেহদী আলি একটু হেলান দিয়ে বসেছিল। এবার সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করলো, কি বললেন।

—আপনি ভাঙা গ্লাসটা যদি জুড়ে দিতে পারেন, তা হলে এই ভাঙা বাড়িটাও আবার সুন্দর রাজপ্রাসাদ করে দিতে পারেন না ম্যাজিকে!

মেহদী আলির মুখের চেহারা বদলে গেল। চোখ দুটো জ্বলজ্বলে হয়ে উঠলো। তীব্র স্বরে বললো, পারলেও আমি তা চাই না। আমি এই বাড়ির সম্পূর্ণ ধ্বংস দেখে যেতে চাই।

মাতালের সব কথার গুরুত্ব দিতে নেই। কিন্তু মেহদী আলির মুখ দেখে মনে হলো, সে একেবারে বুকের ভেতর থেকে কথা বলছে। সে আবার জোর দিয়ে বললো, আমি এ বাড়ির ধ্বংস দেখে যেতে চাই!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

মেহদী আলি একেবারে ফুঁসে উঠলো, কেন তাও জিজ্ঞেস করছেন? বুঝতে

পারছেন না? এই যে গ্রামটা ঘুরে দেখে এলেন, কি দেখলেন? কিভাবে বেঁচে আছে লোকগুলো? একি মানুষের মতন বেঁচে থাকা? না পশুর জীবন? এদের এই অবস্থা কে করেছে জানেন? আমারই পূর্বপুরুষরা। এদের রক্ত শুষে নিয়ে আমরা এই প্রাসাদ বানিয়েছি। এই পাপের প্রাসাদ আমি ধ্বংস করে দিয়ে যাবো।

—কিন্তু, নিজের ঘর ধ্বংস না করে, ওদের উন্নতির জন্য ওদের মধ্যে গিয়ে কিছু কাজ করাই তো ভালো?

মেহদী আলির মুখটা খুব করুণ হয়ে গেল। নেশার অবস্থায় মানুষের দুঃখ, আনন্দ এ দুটোই ফোটে খুব গম্ভীরভাবে। খানিকটা হাহাকারের মতন সে বললো, তা আমি পারবো না। আমার সে ক্ষমতা নেই। আমি হচ্ছি এই সেলজুক বংশের শেষ প্রতিনিধি। আমার পক্ষে ঐ গ্রামের চাষীদের সঙ্গে মেশা সম্ভব নয়। আমিও সহজ হতে পারি না, ওরাও পারে না! তা ছাড়া ওরা আমাকে বিশ্বাস করবে কেন? আমার বাবা ওদের ওপর চাবুক চালিয়েছে, আমাকে ওরা বিশ্বাস করতে পারে? আমি পারবো না—আমি শুধু ধ্বংস করে দিয়ে যাবো—তারপর কেউ যদি গড়তে পারে তো গড়ুক!

—কাশেম বুঝি ওদের নেতা? কাশেম তো ওদের সঙ্গে মিশতে পেরেছে!

—কাশেম? কাশেমকে আমি খুন করবো। আমি নিজে মরার আগে কাশেমকে খুন করে যাবো।

অচেনা জায়গায়, এসব খুন জখমের কথা শুনলে গা শিরশির করে। আমি আর কথা বাড়ালুম না। চুপ করে গেলাম। সুবিমল চুপ করে শুধু মদ্য পান করে যাচ্ছিল, এক সময় শুয়ে পড়লো। মেহদী আলিও আর বেশীক্ষণ টিকলো না, আর একটা বড় চুমুক দিয়ে আবার বিড়বিড় করে বললো, কাশেম! কাশেম! ঐ নিমকহারামটার জান না নিলে…। তারপর মেহদী আলিও শুয়ে পড়লো। আমার হাতের গ্লাসে তখনও খানিকটা পানীয় ছিল, সেটাতে চুমুক দিতে গিয়েও আমার কি মনে হলো, আমি ছলাৎ করে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

এরা দুটোই তো লটকে গেল। এখন আমি একা একা এখানে বসে কি করবো? যে-রকম ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উঠেছি, অন্ধকারে সেখান দিয়ে নিজে নামার সাহস হয় না। কোনো চাকর-বাকরকে ডাকবো? কিন্তু তাতে যদি মেহদী আলির সম্মানের হানি হয়! চাকরেরা ওকে এসে এই অবস্থায় দেখবে—

সুবিমলের ওপরেই বেশী রাগ হলো। কেন পাল্লা দিয়ে খেতে যাওয়া? দু'তিনবার ওকে ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম, সুবিমল, সুবিমল। অতিকষ্টে একবার চোখ খুললো, আমার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বললো, আঃ, দাঁড়া না, বিরক্ত করছিস কেন?

ওকে তোলার কোনো আশা নেই দেখে আমি নিজেই সারা ছাদে পায়চারি করতে লাগলাম। পুকুরের দিকটায় উঁকি মারলাম একবার। ছিদ্রহীন অন্ধকার। যতদূর চোখ যায়—শুধু অন্ধকার—এত অন্ধকার একসঙ্গে বহুদিন দেখিনি। সারা রাতই কি ছাদে কাটাতে হবে নাকি? ওদের নেশা কখন ভাঙবে, কিছুই ঠিক নেই। আমি কি করবো কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আমার ভূতের ভয় নেই, কিন্তু অমন অন্ধকার রাত্তিরে ভাঙা বাড়ির ছাদে যদি আচমকা একটি রমণীমূর্তি দেখতে পাই, তাহলে ভয় পাবো না?

মেয়েটি কখন উঠে এসেছে আমি বুঝতে পারি নি। তাই হঠাৎ মনে হলো যেন জ্যোৎস্না থেকে নেমে এসেছে কোনো অপ্সরী। গাঢ় নীল রঙের একটা শাড়ি পরে আছে, তাতে চুমকি বসানো। তার ফর্সা মুখে চোখ দুটিই যেন প্রধান—যেমন টানাটানা, তেমনি উজ্জ্বল। তার কোমরে চাবির থোকা কিংবা কোনো অলঙ্কার রয়েছে, তাই সেখান থেকে মৃদু ঝুমঝুম শব্দ হচ্ছে।

আমি হতচকিতভাবে তাকিয়ে ছিলাম, মেয়েটি স্বাভাবিকভাবেই বুকের সামনে দু'হাত জোড় করে বললো, নমস্কার, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। আমার নাম জুলেখা।

আমি একটু আড়ষ্টভাবে বললাম, ও আপনিই এ বাড়ির বেগম! নমস্কার।

জুলেখা হাসলো, বললো, বেগম টেগম কিছু নই। এই ভাঙা বাড়ির বউ। আমার আগেকার নাম ছিল জয়া!

—জানি। শুনেছি!

—শুনেছেন? কার কাছ থেকে শুনলেন?

—মেহদী আলিই বলেছে!

—এর মধ্যেই বলা হয়ে গেছে? আর কি বলেছে আমার সম্পর্কে?—বলে নি, যে আমি পাগল?

—না, তো! সে রকম কথা কিছু বলে নি!

—আমাকে কিন্তু পাগলের মতনই আটকে রেখেছে এ বাড়িতে!

জুলেখার ব্যবহারে কোনো জড়তা নেই। কিন্তু আমার একটু অস্বস্তি লাগতে লাগলো। নিঝুম রাত, দু'জন মাতাল হয়ে গড়াচ্ছে, আর এই সময় বনেদী বাড়ির যুবতী বউ গল্প করছে আমার পাশে দাঁড়িয়ে, এই দৃশ্যটা কেমন যেন অস্বাভাবিক। জুলেখা মেয়েটিকে দেখলেই মনে হয়, এ খুব বিপজ্জনক মেয়ে। এই রকম মেয়েরা কখন কি রকম ব্যবহার করবে, তার কোনো ঠিক নেই। এই রকম মেয়েরা পুরুষদের বড় বেশী টানে। আমি তো নিজেকেও বিশ্বাস করি না—!

বললাম, মেহদী আলি আর আমার বন্ধু ঘুমিয়ে পড়েছে এখানে!

সাধারণ ঘুম যে নয়, তা জুলেখাও জানে। কিন্তু কোনো গুরুত্ব দিল না। অবহেলার সঙ্গে বললো, ও রকম প্রায়ই হয়। আপনি কলকাতায় কোথায়

থাকেন ? ইস্, কতদিন কলকাতায় যাই না ! প্রায় পাঁচ ছ'বছর।

—কেন, যান না কেন ?

বিদ্যুতের আলোর মতন হাসলো জুলেখা। বললো, কি করে যাবো ? আমাকে যে পাগল বলে এখানে আটকে রাখা হয়েছে !

এবার আমার সত্যিই একটু ভয় করতে লাগলো। জুলেখা সত্যিই পাগল নয় তো ? সকালবেলা যে-রকমভাবে চেঁচিয়ে কাশেমের নাম ধরে ডাক দিল, তাতে খানিকটা অস্বাভাবিকই মনে হয়েছিল। যতই সুন্দরী হোক, এই রকম অবস্থায় কোনো পাগলির সঙ্গে কথা বলা মোটেই সুবিধের ব্যাপার নয় !

জুলেখা বোধ হয় আমার মনের ভাবটা বুঝতে পারলো। পুনশ্চ হেসে বললো, আমি কিন্তু সত্যিই পাগল নই। আপনি ভয় পাবেন না। আসলে পাগল হচ্ছে আমার স্বামী মেহদী আলি। সারাদিন ওর সঙ্গে কথা বলে আপনারা বুঝতে পারেন নি ?

—না তো ! পাগল হবে কেন ? আমার তো মেহদী আলিকে বেশ ভালোই লেগেছে !

—আমারও ভালো লেগেছিল। বহরমপুরে যখন ওর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। নবাব পরিবারের বংশধর, কিরকম সুন্দর চেহারা—কত আশা করেছিলাম, নবাব বাড়ির বউ হয়ে আসবো—কত দাস-দাসী উঠবে-বসবে আমার হুকুমে, নহবৎখানার সানাইয়ের বাজনায় সকালে ঘুম ভাঙবে। আমার তো হিস্ট্রি অনার্স ছিল, এসব কল্পনা করতে বড় ভালো লাগতো। এখানে ভাঙা ভুতুড়ে বাড়ির মধ্যে আমি বন্দিনী—যে-কোনো কেরানীর বউও আমার চেয়ে সুখী। এখানে দাস-দাসী যে দু একজন আছে, তারা আমার হুকুম শোনে না !

—আপনার বুঝি মানুষকে হুকুম করার খুব শখ ?

—কোন মেয়ের এ শখ থাকে না ? বিশেষত যে মেয়ে স্বামীকে হুকুম করার সুযোগ পায় না ! আমার দুঃখ কি জানেন, এখনও এদের যা আছে, তাও যদি মোটামুটি বাঁচিয়ে রাখা যেত তাহলেও 'খুব কম হতো না। কিন্তু মেহদী আলি চায় সব কিছু নষ্ট করতে, এমন কি ওর বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাও তেমন জোরালো নয়। ওর সঙ্গে আমিও কেন নিজেকে নষ্ট করতে যাবো ? আমার তো বাঁচতেই ইচ্ছে করে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে এ বাড়িতে !

—তা আপনি অন্য কোথাও চলে গেলেই পারেন ? মুসলমানদের মধ্যে তো শুনেছি, বিবাহ-বিচ্ছেদ খুব সহজ ব্যাপার !

—সব সময় সোজা নয়। মেহদী আলি আমাকে এ বাড়িতে আটকে রেখেছে, আমার বেরুবার উপায় নেই। বেরিয়েই বা একা একা কোথায় যাবো ?

—বাপের বাড়িতে যান না ?

—ব্রাহ্মণের মেয়ে ছিলাম। মুসলমানকে বিয়ে করেছি স্বেচ্ছায়, আর কি বাপের বাড়ি ফেরা যায় ! তাছাড়া যাবোই বা কি করে ? একমাত্র কাশেমই আমার

ভরসা। ঐ আর একটা পাগল!

আমার কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠছে যদিও, কিন্তু এদের একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার শুনতে চাওয়াও উচিত নয়। তাছাড়া এখানকার ধরন-ধারণ আলাদা। কাশেম কি জুলেখাকে ভালোবাসে? এ কি ধরনের নগ্ন ভালোবাসা, কাশেম চায় তার স্বামীর কাছ থেকে জুলেখাকে কেড়ে নিতে! আর জুলেখার স্বামী তা জেনেশুনে বন্দী করে রেখেছে স্ত্রীকে! এক হিসেবে এই রকম সরল ভালোবাসাই তো স্বাভাবিক—কিন্তু আমরা অনেক ঘোরপ্যাঁচে একে জটিল করে রেখেছি।

জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, কাশেম বুঝি আপনাকে ভালোবাসে?

—পাগলের ভালোবাসা? এক সময় কাশেম আর মেহদী আলির কি ভাব ছিল আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না। যাকে বলে হরিহর আত্মা। কাশেম আমার সঙ্গে কথা বলতেই লজ্জা পেত, আমার সামনে আসতই খুব কম, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতো। তারপর একদিন কাশেম—আমাকে কিছু বলে নি, মেহদী আলিকেই বলেছিল, ও আমায় ভালোবাসে, আমাকে না পেলে ও মরে যাবে! তারপর শুরু হয়ে গেল দু'জনের মারামারি। যেন আমার মতামতের কোনো মূল্যই নেই। ভেবে দেখুন। একে পাগলামি বলা উচিত নয়!

—মেহদী আলির দিক থেকে আমি তো কোনো পাগলামি দেখছি না। নিজের স্ত্রী সম্পর্কে কেউ ওকথা বললে রাগ তো হবেই।

—আচ্ছা, মনে করুন, আপনার স্ত্রী সম্পর্কে যদি কেউ এরকম বলতো। আপনি কি করতেন?

—আমি কি করে জানবো? আমি তো বিয়ে করিনি!

—করেন নি এখনো?

—শুনুন, রাত তো কম হয় নি, ওদের দুজনকে তোলার কি ব্যবস্থা করা যায়?

—ওরা থাক্, শুনুন। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন?

—কি সাহায্য?

—আপনি আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন?

শুনতে বেশ রূপকথা রূপকথা লাগলো। যেন বন্দিনী রাজকন্যা পাষাণ দুর্গ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য আকুতি জানাচ্ছে। রাজকন্যা না হোক, নবাব-পত্নী তো বটে। কিন্তু আমি তো বিদেশী রাজপুত্র নই। আমি কলকাতা শহরের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবার মতন একজন মানুষ। আমার চেহারা দেখলে কেউ আমাকে কোটালপুত্রও বলবে না।

সামান্য হেসে আমি বললুম, তা কি হয়। মেহদী আলির সঙ্গে এরকম একটা বিশ্বাসঘাতকতা করবো কি করে? মেহদী আলি আমাদের সঙ্গে সব সময় এত ভালো ব্যবহার করছে, ওর মনে কোনোরকম আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—ও কোনো আঘাত পাবে না। মৌলবী সাহেবের মেয়ে ওকে ভালোবাসে। তাকে বিয়ে করে ও সুখী হবে।

—তা হয় না। তা ছাড়া আমি আপনাকে কোথায় নিয়ে যাবো?

—যে-কোনো জায়গায়। আমি এখানে আর থাকতে পারছি না।

—আপনাকে এই একটু আগে প্রথম দেখলাম। ভালো করে চিনিই না! আপনাকে কি যে-কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়?

—আপনারা তাহলে কোনো উপায়ে কাশেমের সঙ্গে আমার একটু দেখা করিয়ে দিন। আমি বুঝতে পেরেছি, কাশেম ছাড়া আমার আর কোনো গতি নেই। কাশেমই আমাকে একমাত্র আশ্রয় দিতে পারে।

—আমরা দু'দিনের জন্য একটা কাজে এখানে এসেছি। আমাদের পক্ষে এ ধরনের কোনো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া উচিত হবে না।

—দেখুন, আমিও তো হিন্দু ঘরের মেয়ে ছিলাম। আপনি হিন্দু হয়ে আমাকে এইটুকু সাহায্য করবেন না?

এই প্রথম জুলেখাকে আমার একটু খারাপ লাগলো। আমি ওকে একটা নিষ্ঠুর কথা বলতে গিয়েও সামলে নিলাম। মুখের হাসিহাসি ভাবটা বজায় রেখেই বললাম, আপনি একটা মারাত্মক ভুল করছেন। আমি হিন্দু নই। কোনো আচার অনুষ্ঠান মানি না, ভগবানেও বিশ্বাস করি না। নানারকম অখাদ্য-কুখাদ্য খাই। আমি কি করে হিন্দু হবো? তাছাড়া পুরুষ হিসেবে যদি আপনাকে সাহায্য করতে না পারি, তবে হিন্দু হয়ে আর কি সাহায্য করবো?

জুলেখা খানিকটা মুষড়ে পড়লো। দূরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বললো, আমি জানি কাশেম কোথাও না কোথাও এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমার যাবার উপায় নেই। চার পাঁচ জন লোক বাড়ির বাইরে পাহারা দিচ্ছে। আমাকে এখানেই মরতে হবে। একটা ছেলেমেয়ে হলেও তাকে নিয়ে সান্ত্বনা পেতাম। কিন্তু তাও কোনোদিন হবে না—

—মেহদী আলি ছেলেমেয়ে পছন্দ করে না?

—ও কোনো সন্তান চায় না। কারণ ও যে চায়, ওর সঙ্গে সঙ্গেই এ বংশের শেষ হয়ে যাক।

—ও চায় ও-ই এই বংশের শেষ উত্তরাধিকারী থাকবে। এক একদিন রাত্তিরে বোতল-বোতল মদ খেয়ে পাগলের মতন চ্যাঁচায়। হাত দিয়ে দেয়ালের ইঁট ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে। এই বাড়িটা পর্যন্ত ভেঙে ফেলতে চায়। আমি একদিন অতিষ্ঠ হয়ে পালাতে গিয়েছিলাম রাত্তিরবেলা। সেদিন কি হয়েছিল আমার দেখবেন? এক জায়গায় দেয়ালের ওপর থেকে পড়ে গিয়ে এতখানি পা কেটে গিয়েছিল।

জুলেখা শাড়িটা উঁচু করলো পায়ের ডিম পর্যন্ত। আবছা অন্ধকারের মধ্যেও আমি দেখতে পেলাম, তার ডান পায়ে মস্ত বড় একটা কাটা দাগ, এখনো

ভালো করে ঘা শুকোয় নি। কোনো রূপসী মেয়ের শরীরে ওরকম কোনো ক্ষত আমি কখনো দেখিনি, শরীরে কি রকম একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো।

জুলেখা তখনও শাড়িটা উঁচু করে আছে, তার মুখে কি রকম যেন রহস্য মাখানো হাসি। এসব ব্যাপার আমার অজানা নয়। আমি মুচকি হেসে বললুম, মেহদী আলি তা হলে আপনাকে বিয়ে করেছিল কেন? শুধু শুধু কষ্ট দেবার জন্যে?

—না, বিয়ের সময় এরকম ছিল না। তার পরেও দু'এক বছর খুব ভালো ছিল। তখন অনেক পরিকল্পনা ছিল—এ বাড়ি সারাবে, পুকুরপাড়ের জমিতে চিনির কল বসাবে—এই সব। ওর মায়েরই তো দোষ। ওর মা একদিন গল্প করলো যে ওর বাবার কি রকম রাগ ছিল। একদিন নাকি তিনি যখন খেতে বসেছেন, তখন একজন চাকর অসাবধানে জলের গ্লাস উল্টে দেয়। রাগের চোটে তিনি তখন ভাতের থালা ফেলে উঠে সেই মুহূর্তে চাকরটাকে চাবুক দিয়ে এমন মারতে লাগলেন যে, সে বেচারা মরেই গেল? এইসব শোনবার পর থেকে মেহদী কিরকম যেন বদলে যায়। আস্তে আস্তে শুরু হলো এইসব পাগলামি।

আমি বললাম, আপনি যাকে পাগলামি বলছেন, আমার তো সে জন্য শ্রদ্ধাই হচ্ছে ওকে!

জুলেখা হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললো, আপনি বিয়ে করেন নি। কিন্তু আপনি বুঝি কোনো মেয়েকে ভালোবাসেন?

—হ্যাঁ, একটি মেয়েকে ভালোবাসি ঠিকই। কিন্তু তাকে এখনো চোখে দেখি নি!

এই সময় মেহদী আলি ধড়ফড় করে উঠে বসলো, তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, কে? কে ওখানে? কে?

আমি কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, আমি।

তখনও ঘোর কাটে নি, আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললো, কে? কাশেম?

—আমি সুনীল।

এবার চিনতে পারলো। লজ্জিত ভাব দেখিয়ে বললো, তাই তো—সুনীলবাবু! ইস্‌, কত রাত হয়ে গেল? চলুন—

মৌলবী সাহেবকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়। ধপ্‌ধপে মাথার চুল, ধপ্‌ধপে দাড়ি, দৃষ্টিটি ভারী সহৃদয়। আলমারির চাবি খুলে সব টেনে টেনে বার করতে লাগলেন। ভেতরে সব অমূল্য সম্পদ। সুবিমল এক একটা জিনিস দেখছে আর আনন্দে ওর চোখ চকচক করছে। দুর্লভ সমস্ত পারস্য-পাণ্ডুলিপি — সোনার জল দিয়ে আঁকা ছবি, বহু রকমের হাতের লেখা কোরআন। অসংখ্য

পোরসিলিনের পাত্র, জেড-এর মূর্তি, হাতির দাঁতের খাপে ভরা ছুরি।

মৌলবী সাহেব আপসোসের সঙ্গে বললেন, আজকাল এসব জিনিস এই পাড়াগাঁয় কেই-বা দেখে, কেই-বা কদর জানে। এখানে একজন মানুষও ফার্সী জানে না, এসব পুঁথি কে পড়বে বলেন? আমিও জানি না। উইয়ে ধরে নষ্ট হচ্ছে।

মৌলবী সাহেব ফোকলা দাঁতে ম্লানভাবে হাসলেন। মেহদী আলি দাঁড়িয়ে আছে পাশে, সুবিমলকে বললো, আপনার যা-যা দরকার বেছে নিন।

মৌলবী সাহেবের ধারণা, আমরা এসেছি কোনো সরকারী মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, নিয়ে যান, যদি তবু শহরের পাঁচজন লোক দেখে—খানিকটা কাজ হবে। এখানে তো সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সুবিমল আর আমি চোখে চোখে কথা বলছি অনবরত। অর্থাৎ জিনিস-গুলোর দাম হওয়া উচিত অনেক, কিন্তু কি রকমভাবে দরাদরি করা হবে। প্রথম থেকেই জিনিসগুলোর প্রশংসা করার বদলে সুবিমল অনবরত বলে যাচ্ছে, এটা অবশ্য কপি—এ রকম কপি অনেক পাওয়া যায়। এগুলো আসল পোরসিলিন নয়—এটার তো কানা ভাঙা, কোনো দামই নেই।

আমি মেহদী আলিকে অন্যমনস্ক করার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, এইসব জিনিস আর পুঁথিপত্র—এগুলো কি আপনার বাবা কিনেছিলেন?

মেহদী আলি বললো সবগুলোর কথা জানি না। তবে, আমার বাবা নিরক্ষর ছিলেন, পুঁথিপত্রের শখ তাঁর থাকার কথা নয়। তবে বিলাসী লোক ছিলেন। ঐ সব প্লেটগুলো বোধ হয় তাঁরই কেনা।

সুবিমল যা জিনিসপত্র বাছলো, তাতে দু'টো গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে যায়। হাতের ধুলো ঝেড়ে সুবিমল মেহদী আলিকে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে বললো, এবার বলুন, কত দাম দিতে হবে।

মেহদী আলি সবিস্ময়ে বললো দাম আবার কি? আপনি এমনিতেই নিয়ে যান।

সুবিমলও এতটা বিশ্বাস করতে পারলো না। গদ্‌গদভাবে হেসে বললো, না, না, এমনিতে নেবো কেন? সবগুলো আলাদা আলাদা হিসেব না করে সব মিলিয়ে একটা কিছু বলুন।

—আপনাকে একটি পয়সাও দিতে হবে না! এবাড়ির লোক কখনো কোনো কিছু বিক্রি করতে জানে না! আপনি নিয়ে যান, আমি গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!

সুবিমল অত সহজে ভোলার ছেলে নয়। বললো, তা হয় না! এত জিনিস আমি নিয়ে যাবো, একটা কিছু দাম না দিলে চলবে কেন? আপনি বরং একটা টোকেন অ্যামাউণ্ট নিন। এই ধরুন হাজার দেড়েক টাকা!

—আমি একটা পয়সাও চাই না। প্রজাদের রক্ত শোষণ করা টাকায় তো কেনা—এর দাম নেবার অধিকার আমার নেই।

—ঠিক আছে, আমি এ জিনিসগুলোর একটা লিস্ট তৈরি করছি। আপনি লিখে দিন, যে আপনি এগুলো আমাদের দান করলেন। নইলে পরে যদি কোনো গোলমাল হয়—

সব জিনিসগুলো প্যাক করে ভর্তি করা হলো দুটো গরুর গাড়িতে। গাড়ির জন্যও কোনো ভাড়া লাগবে না। এবারে একটা খুব বড় দাঁও মারা গেছে, সুবিমল খুব খুশী। ওর ইচ্ছে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ে—ট্রেনে মালপত্রগুলো না তোলা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। কিন্তু মেহদী আলি কিছুতেই না খাইয়ে ছাড়বে না আমাদের। তাড়াতাড়ি স্নান করে তৈরি হয়ে নিতে লাগলাম।

আজ খাওয়ার ঘরে জুলেখা এসে উপস্থিত হয়েছে। কাল রাত্রিতে যে জুলেখার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল, মেহদী আলি সে কথা ভুলে গেছে। প্রথাসম্মতভাবে আমাদের সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিল।

জুলেখা অসম্ভব রকমের গম্ভীর আজ, মুখখানা থমথমে হয়ে আছে। ওকে দেখার পর মেহদী আলিও গম্ভীর হয়ে গেছে। নিতান্ত ভদ্রতা রক্ষার জন্য কথা বলছে দু'একটা। আজ খাওয়াটা ঠিক জমলো না, ভোজ্যবস্তু যথেষ্ট ছিল, কিন্তু আবহাওয়াটা কি রকম অস্বস্তিকর। জুলেখা মাঝে মাঝে আমার চোখে চোখ ফেলে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকছে, কি যেন সে বলতে চায় -কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না। জুলেখাকে এখনও আমি সামান্যই চিনি। অপরিচিতা নারীর চোখের ভাষা বোঝার ক্ষমতা আমার নেই।

খাওয়া শেষ হবার পর নিচে এসে জামা-কাপড় পরে নিচ্ছি, হঠাৎ জুলেখা এসে হাজির হলো। চোরের মতন পা টিপে টিপে। আমরা দুজনেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। দু'জন পুরুষ পোশাক পরছে, এ সময়ে কোনো নারীর প্রবেশ যথেষ্ট অসমীচীন। সুবিমল সদ্য আন্ডারওয়্যার পরে প্যান্টে পা গলিয়েছে, ছুটে গেল ঘরের কোণে। আমার গায়ে শুধু গেঞ্জি।

জুলেখা ওসব ভ্রূক্ষেপ করলো না। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো, অ পনারা আমার স্বামীকে ঠকিয়ে কি কি নিলেন। সবাই ওকে ঠকায়।

সুবিমল বললো, ঠকিয়ে নেবো কেন ; কি আশ্চর্য, আমরা—

জুলেখা বললো, এ সব জিনিসের অনেক দাম। আপনারা আমাকে সেই দাম দিয়ে যান।

—মেহদী আলি এগুলো আমাদের দান করেছে। আমাদের কাছে তার সই করা কাগজ আছে।

—কিন্তু ওগুলো কি আমারও সম্পত্তি নয়। একে একে আমার সব চলে যাচ্ছে, আমার আর কি থাকবে ?

সুবিমল সৌজন্য দেখিয়ে বললো, ঠিক আছে মেহদী আলিকে ডাকুন। ও যদি চায়—আমি এখনও আমাদের যথাসাধ্য টাকা দিতে রাজী আছি। আমরাও

বিনা পয়সায় কিছু নেবার জন্য আসিনি।

জুলেখা একবার চকিতে দরজার দিকে তাকিয়ে বললো, ঠিক আছে টাকার দরকার নেই। আপনারা আমাকেও নিয়ে চলুন।

সুবিমল তো আর কাল রাত্তিরের কথা শোনে নি। ও হতভম্বের মতন তাকালো একথা শুনে। জুলেখা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কি এক উত্তেজনায় ঘন ঘন নিশ্বাসে ফুলে উঠছে ওর বুক। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন অলীক। আমার মনে হলো, জুলেখা যেন বলতে চায়, আমরা এ বাড়ির ভাল ভাল সম্পদ নিয়ে যাচ্ছি সেই হিসেবে কি ওকেও নিয়ে যেতে পারি না? আর সব মূল্যবান জিনিসের মতন ও-ও তো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এ বাড়িতে থেকে। কিন্তু জ্যান্ত সম্পদ বড় বিপজ্জনক, ও নিয়ে নাড়াচাড়া করার জন্য তো আমরা এখানে আসিনি।

জুলেখা আবার বললো, আমাকে অন্তত কাশেমের কাছে পৌঁছে দিন। গ্রামটা পার করে দিলেই—

ঠাণ্ডাভাবে বললুম, আপনি এবার ওপরে যান। আপনাকে এ সময় এঘরে দেখলে কেউ অন্য রকম কিছু ভাববে।

জুলেখা আবার মিনতি করলো, আপনারা অন্তত থানায় একটা খবর দিয়ে দিন যে আমাকে এ বাড়িতে জোর করে আটকে রেখেছে।

সুবিমল এবার হুংকার দিয়ে উঠলো, কি! আমরা আর যাই হই, নেমকহারাম নই। মেহদী আলি আমাদের উপকার করেছে, আর আমরা তার নামে থানায় খবর দেবো?

এই সমস্যা সমাধানের একটিমাত্র উপায় তখন আমার মনে পড়লো। আমি দরজার কাছে এগিয়ে গলা চড়িয়ে ডাকলাম, মেহদী আলি সাহেব। মেহদী আলি সাহেব। উপর থেকে জবাব এলো।—আমি আসছি এক্ষুনি, আপনাদের হয়ে গেছে? জুলেখা আমার দিকে একবার জ্বলন্ত চোখে তাকালো, তারপরই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মেহদী আলি আমাদের বিদায় জানাতে এলো প্রধান ফটক পর্যন্ত। প্রচুর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা ওর হাত চেপে ধরলাম। সুবিমল বললো, কলকাতায় গেলেই দেখা করবেন কিন্তু। মেহদী আলি বিমর্ষভাবে বললো, কলকাতায় আবার কবে যাব ঠিক নেই। আচ্ছা, বিদায়!

নবাব বাড়ির এলাকা ছাড়িয়ে আমরা সামান্য কিছুদূর মাত্র এগিয়েছি, এমন সময় হৈ হৈ করে একদল লোক নিয়ে কাশেম এসে চড়াও হলো। রক্তবর্ণ চোখে জিজ্ঞেস করলো, এসব মালপত্র কার হুকুমে নিয়ে যাচ্ছো?

আমি সুবিমলের দিকে তাকালাম। সুবিমলের মুখখানা চাপা রাগে গনগনে হয়ে উঠেছে। আমি তবু ওকে বললাম, মাথা গরম করিস না!

সুবিমল দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলালো। শান্তভাবে বললো, এসব মেহদী আলির সম্পত্তি, সে আমাদের দিয়েছে।

—মেহদী আলি দেবার কে? গাঁয়ের জিনিস, গাঁয়েই থাকবে।

—এ গাঁয়ের জিনিস বুঝি কারো বিক্রি করার অধিকার নেই? আমাদের কাছে দলিল আছে।

—ওসব দলিল-ফলিল মানি না। আপনারা নামুন গাড়ি থেকে।

সুবিমল এবার গর্জন করে উঠলো, কেন নামবো? কার হুকুমে! আমি সুবিমলের হাত ধরে তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলুম। হঠাৎ দাঙ্গা-টাঙ্গা লেগে যাওয়াও বিচিত্র নয়। সুবিমলের একটুও ভয় নেই, সে একেবারে বেপরোয়া। থানা-টানা এখান থেকে কতদূর তার ঠিক নেই। শান্তভাবে কাশেমকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। দেখুন, আমরা তো বে-আইনি কিছু করছি না।

—আগে আপনারা নামুন গাড়ি থাকে। এই বশীর, বয়েল খুলে দে।

ব্যাপার ঘোরালো হয়ে উঠছে দেখে আমি জোর করে সুবিমলকে গাড়ি থেকে নামালুম। শক্ত করে ধরে রইলুম ওর হাত। সুবিমল নিজেই যাতে হঠকারীর মতন কিছু করে না ফেলে সেইজন্য আমি চোখ গরম করে কাশেমকে বললুম, আপনি ভেবেছেন কি।

—চুপ করুন।

—অত ধমকে কথা বলছেন কাকে? আপনাকে আমরা ভয় পাই?

কাশেমের সঙ্গে আরও দশ বারো জন লোক। তাদের মধ্যে থেকে একজন দীর্ঘকায় লোক এগিয়ে এসে বললো, বাবু সাহেব, আপনারা সরে দাঁড়ান, এ জিনিস নিতে পারবেন না! গাঁয়ের জিনিস, গাঁয়েই থাকবে।

সুবিমল আবার চেঁচিয়ে উঠলো, গাঁয়ের কটা লোক এর কদর বুঝবে?

কাশেম চেঁচিয়ে উঠলো, গাড়ি থেকে মাল বার করো।

তারপর এক দক্ষযজ্ঞ শুরু হলো। লোকগুলো সব ঝাঁপিয়ে পড়ে জিনিসগুলো টেনে টেনে বার করতে লাগলো। দুর্লভ বহুমূল্য সব পাণ্ডুলিপির পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে উড়তে লাগলো হাওয়ায়, ভাঙলো অনেক মূর্তি আর বাসন, ওরা ইচ্ছে করে জিনিসগুলো নষ্ট করতে লাগলো, পোরসিলিনের বাসনপত্র কেউ নিতে লাগলো গামছা বেঁধে।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বুঝতেই পারছি, আর কিছু করার নেই। ভাঙা-চোরার দৃশ্য দেখতে আমার ভালোই লাগলো। সুবিমল ঐ সব জিনিসগুলোর মর্ম সত্যিকারের বোঝে, ভালোবাসে ঐ সব প্রাচীন শিল্পকীর্তি—পাগলের মতো ছুটে গিয়ে যতগুলো পারে বাঁচাবার চেষ্টা করলো। পারলো না প্রায় কিছুই।

লুঠতরাজ তখনও শেষ হয় নি, এমন সময় দু'জন সঙ্গীর সঙ্গে ছুটতে ছুটতে

এসে হাজির হলো মেহদী আলি। সোজা সে ঝাঁপিয়ে পড়লে কাশেমের ওপর। কাশেম ছিটকে মাটিতে পড়ে গিয়েই আবার উঠে দাঁড়ালো, একজন লোকের হাত থেকে বাঁশের ডাণ্ডা কেড়ে নিয়ে তুললো সেটা মেহদী আলির মাথা লক্ষ্য কে আমি শিউরে উঠে দেখলাম, মেহদী আলির হাতে একটা লম্বা ছুরি।

বাকি লোকেরা ওদের থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। সুবিমল চেঁচিয়ে বললো, সুনীল, দেখছিস কি? শিগগির আটকা।

কাশেম লাঠিটা তুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মেহদী আলির ডান হাতে ছুরি ধরা, দু'জনেই দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, আজ জান নিয়ে নেবো!

আমি আর সুবিমল দু'দিক থেকে এগুতে যেতেই মেহদী আলি চেঁচিয়ে উঠলো, আপনারা সরে দাঁড়ান। সঙ্গে সঙ্গে সে লাফিয়ে উঠলো, কাশেম লাঠিটা চালাবার আগেই মেহদী আলি সেটা ধরে ফেলেছে, এক ঝটকায় ফেলে দিল লাঠিটা। ঝোঁক সামলাতে গিয়ে মেহদী আলি একটু হেলে পড়েছিল, আবার সোজা হয়ে ছুরি তুললো, কাশেম ততক্ষণে ছুটতে শুরু করেছে। একটা চাপা গর্জন করে মেহদী আলি তাকে তাড়া করলো।

রাস্তার পাশে নিচু মাঠ—সেই মাঠ ভেঙে এঁকেবেঁকে ছুটছে কাশেম, তার পেছনে পেছনে ছুটছে মেহদী আলি। একটা লোকও ওদের বাধা দিতে গেল না। সবাই দুর্বোধ্য শব্দে চেঁচাতে লাগলো।

দৃশ্যটা আদিমকালের মতন। একজন নারীর জন্য লড়াই করছে দুজন পুরুষ। কাশেমের শক্তিশালী দৃঢ় শরীর, তাকে ধরা অত সহজ নয়! মেহদী আলিকে দেখে মনে হয় তুলতুলে দেহ, কিন্তু সেও দৌড়োচ্ছে অসম্ভব দ্রুতবেগে। আমি বুঝতে পারলুম, নিজের স্ত্রীর ওপর অধিকার হারিয়েছে বলেই মেহদী আলি আর সব কিছুর উত্তরাধিকার সম্পর্কে এত উদাসীন! গ্রামের লোকজন বোধহয় ওদের ঝগড়ার কথা জানে, তাই কেউ বাধা দিতে গেল না। কেউ হয় মেহদী আলিকে এর আগে গ্রামের মাঠে এরকম দৌড়োতেও দেখে নি!

ছুটতে ছুটতে অনেক দূর চলে গেছে ওরা, অসম্ভব উত্তেজনায় আমরা তাকিয়ে আছি। এখন আর আমাদের কিছু করার নেই। অত দূরে গিয়ে আমরা আর বাধা দিতে পারবো না। নারীর জন্য এরকম ছুরি-হাতে মারামারির দৃশ্যও আমরা আগে কখনো দেখিনি, প্রকাশ্য দিনের আলোয় এরকম হতে পারে কল্পনাও করতে পারিনি!

কাশেমের দুর্ভাগ্য, সে একবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। যে পলাতক সে-ই হারে। মেহদী আলি নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই এত জোর পেয়েছে। কাশেম পড়ে যাওয়া মাত্রই মেহদী আলি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমরা দেখতে পেলাম রোদ্দুরে মেহদী আলির রক্তাক্ত ছুরি ঝলসে উঠলো তিনচারবার। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে এগিয়ে আসতে লাগলো এদিক, ছুরিটা ফেলে দিল মাঠে। তার মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের হাসি।

আমি পেছন ফিরে একবার ভাঙা প্রাসাদের দিকে তাকালাম। জুলেখা এবার মুক্তি পাবে।